শাশ্বত ভারত

উপদেবতার কথা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

জে. এস. প্রকাশনী
৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩

পরিবেশক ঃ

জ্যোতি প্রকাশনী

এ ১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

সুবর্ণ রেখা

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ

(১) জ্যোতি প্রকাশনী

(২) সুবর্ণ রেখা

(৩) কথা ও কাহিনী ও বইপাড়ার অন্যান্য দোকান।

প্রচ্ছদ ঃ শ্রী তাপস পাল

প্রকাশক ঃ
মীরা ঘোষ
জে. এস প্রকাশনী
৩এ, মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক ঃ
শ্রী শিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

শ্রীসুভাষচন্দ্র সরকার

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের লেখা

ছোট গল্প

অগ্নি অরন্ধনে, কী মায়া, গল্প শুধু গল্প

*

ভ্রমণের গল্প

সুন্দর নেহারি, কেরালার উপকূলে

*

ভ্রমণ কাহিনী

তীর্থের পথে, রূপমতীর দেশে, কানাড়া দেখা হল না, তীর্থ পরিচয় (যন্ত্রস্থ)

*

ভ্রমণ সঙ্কলন

শ্রীসুষমা চক্রবর্তীর সহযোগিতায়

শতবর্ষের পথযাত্রা

*

ভ্রমণ উপন্যাস

মণিপদ্ম, তুঙ্গভদ্রা, একজন লামা ও মানস সরোবর, আরও আলো,
কুটিল কুমায়ুন, কাশ্মীরী বাহার, তিন পাহাড়, অন্য এক দেশ

*

ব্যঙ্গ উপন্যাস

কুম্ভীপাক বীক্ষ্য

*

উপন্যাস

রূপম ?, সেই উজ্জ্বল মুহূর্ত, একটি আশ্বাস, জনম জনম, মেঘ, কল্কিরুবাচ,
আয় চাঁদ, তারার আলোর প্রদীপখানি, বাঁধ ভেঙে দাও, মৌন মন,
তারা ভেসে চলেছে, চোখের আলোয় দেখেছিলেম, একটি নাটক নিয়ে,
তিনজন নায়িকা (যন্ত্রস্থ)

*

ছোটদের জন্য

আমাদের দেশ

উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মহিসুর ও তামিলনাড়ু

*

শাশ্বত ভারত

দেবতার কথা, ঋষির কথা, অসুরের কথা, উপদেবতার কথা ও তীর্থের কথা

*

রম্যাণি বীক্ষ্য

*

কোথায় ঈশ্বর

*

বিষ্ণুপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ (সারানুবাদ), কল্কিপুরাণ (সম্পূর্ণ অনুবাদ),
শ্রীমদ্‌ভাগবত (যন্ত্রস্থ)

ভদ্রং নো অপি বাতয় মনো দক্ষমুত ক্রতুম্।
অধা তে সখ্যে অন্ধসো বি বো মদে
রণন্ গাবো ন যবসে বিবক্ষসে ॥

—ঋ. ১০।২৫।১

আমাদের মন তুমি এমন কর
যাতে নিপুণ ও কর্মিষ্ঠ হয় তা।
তৃণক্ষেত্রে গাভীর মতো আমরাও যেন
ভাগী হতে পারি তোমার আনন্দের।

—ঋ. ১০।২৫।১

দেবতা ঋষি ও অসুরের কথায় শাশ্বত ভারতের প্রাচীন সমাজের কথা শেষ হয় না। দেবাসুরের সংগ্রামের সময় ঋষিরা যেমন দূরে থাকতেন, তেমনি দূরে থাকতেন আরও কয়েকটি জাতি। যক্ষ নাগ কিন্নর গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি জাতিরাও কোনও পক্ষ অবলম্বন করতেন না। কিন্তু দেবতারা জয়ী হলে ঋষিরা সুখী হতেন এবং অপ্সরা ও গন্ধর্বরা আকাশে নৃত্যগীত করতেন। যক্ষ নাগ ও কিন্নরেরাও অসুরদের সাহায্য করতেন না। এঁদের প্রত্যেকের যে আলাদা সমাজ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সব সমাজের কথা আমাদের কাছে পরিচিত নয়। আমার মনে হল যে এই সমস্ত জাতির কথা না জানলে শাশ্বত ভারতের প্রথম সমাজের কথাই আমাদের জানা হবে না। কিন্তু গুরুজী কি এ সব কথা আমাদের বলবেন!

আকার আকৃতি দেখে যে সে যুগে জাতি বিচার হত না, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। রাক্ষসদের কথা বলবার সময় গুরুজী আমাদের সেই কথা বলেছেন। সীতার অন্বেষণে হনুমান এসেছেন লঙ্কার অশোক বনে। এক মলিন-বসন দুঃখিনী সুন্দরীকে দেখে হনুমান বৃক্ষশাখা থেকে তাঁর সামনে অবতরণ করলেন। তারপর প্রণাম করে বললেন, হে শোভনে, আপনি কার কন্যা বা বধূ? দেবতা অসুর নাগ গন্ধর্ব রাক্ষস যক্ষ বা কিন্নরের আপনি কে?

সুরাণামসুরাণাঞ্চ নাগ গন্ধর্ব রক্ষসাম্।
যক্ষাণাং কিন্নরাণাঞ্চ কা ত্বং ভবসি শোভনে॥
কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা বরাননে।
বসুনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে॥

হে বরাননে, আপনি কি রুদ্র মরুৎ বা বসুদের কন্যা বা বধূ। আপনাকে আমার দেবতা বলে মনে হচ্ছে।

কবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে এই কথা বলেছেন। এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আকারে আকৃতিতে সে যুগের সমস্ত জাতিই ছিল মানুষের মতো। সীতাকে দেখে হনুমান তাই দেবতা বলে অনুমান করেছিলেন, আর নিঃসন্দেহ হবার জন্য প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে। দেবতা ও অসুরে যে রূপের ভিন্নতা, সে আমাদের এ কালের কল্পনা। তবু সে কল্পনায় প্রভেদ বেশি নেই। দেবতাকে আমরা মানুষের মতোই গড়ি, আর মানুষের মুখে একটা কঠিন নিষ্ঠুর ভাব আনতে পারলেই তাকে অসুর বলে চালিয়ে দিই। মেয়েদের বেলায় হয়তো তাও সম্ভব নয়। প্রভেদ হয়তো ছিলই না। তাই দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমা দৈত্যের কন্যা শচীকে বিবাহ করেছিলেন, গন্ধর্বকন্যা সরমাকে বিবাহ করেছিলেন বিভীষণ, আবার জরুৎকারু মুনি বিবাহ করেছিলেন বাসুকী নাগের ভগিনী জরৎকারু বা মনসাকে।

দ্বাপরে এই জাতিভেদ খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণের কথায় আমরা তা জানতে পারি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের হাতে ঘটোৎকচ নিহত হবার পরে কৃষ্ণ তাঁর রথের উপরে আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। ঘটোৎকচ ভীমের পুত্র, কিন্তু রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত বলে রাক্ষস নামে পরিচিত। অর্জুন এই আচরণে দুঃখ পেয়ে কৃষ্ণকে তাঁর হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কৃষ্ণ বলেছিলেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি জরাসন্ধ শিশুপাল ও একলব্যকে বধ করিয়েছি। জগতের হিতার্থে দেবদ্বেষীদের বিনাশের জন্য আমি হিড়িম্ব বক কির্মীর ও অলায়ুধকেও নিহত করিয়েছি। ঘটোৎকচকে কর্ণ বধ না করলে আমি নিজেই তাকে বধ করতাম।

অসুরের কথায় গুরুজী আমাদের এই কথা বলেছিলেন। কৃষ্ণ যাদের দেবদ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্মা বলে ঘৃণা করেছেন, আসলে তারা অনার্য জাতি। অনার্যরা শক্তিমান ও পরাক্রান্ত বলেই আর্যরা যে তাদের ঘৃণা করতেন তাতে সন্দেহ নেই। জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণ নিজে মথুরা থেকে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন। একলব্য একদিন অদ্বিতীয় বীর হবে জেনে দ্রোণাচার্য তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা নিয়েছিলেন।

এইখানে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি। সত্যযুগে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধের কথা আমরা দেখতে পাই। আর ত্রেতায় ও দ্বাপরে দেখি মানুষের সঙ্গে রাক্ষসদের যুদ্ধের কথা। ত্রেতার রাক্ষস রাবণ অবশ্য দেবতাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন। এই সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আর একটি কথা আমার মনে এল। সত্যযুগে দেবাসুর ছিলেন প্রধান, আর ত্রেতায় ও দ্বাপরে মানুষ নিয়েছে নায়কের ভূমিকা, দেবতারা দূরে সরে গেছেন। অন্য দিকে অসুরদের বদলে রাক্ষসেরা প্রবল হয়ে উঠেছে ত্রেতায়, কিন্তু দ্বাপরে তারাও কাবু হয়েছে মানুষের কাছে। দেবতারাই কি কর্মদোষে মানুষ হয়ে গেলেন! আর অসুরেরা অদৃশ্য হলেন শক্তির অভাবে!

সকাল বেলায় আশ্রমের ঘরে বসে আমি এই সব কথা ভাবছিলাম। সহসা পাধ্যে এসে আমাকে ডাকলেন: তোমার কি শরীর খারাপ করেছে বিনায়ক?

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললাম: না তো।

তবে তুমি ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে আছ কেন!

এই তো আমি কাজে আসছি।

বলে তখনি বেরিয়ে পড়লাম।

আমার সঙ্গে চলতে চলতে পাধ্যে বললেন: আমাদের লাগানো বীজ থেকে কেমন চারা বেরিয়েছে দেখেছ তো!

সকালের সোনালী রৌদ্রে ভরে গিয়েছিল আমাদের সব্জির ছোট বাগানটি। এই তো সেদিন আমরা এই আশ্রমে এসে জুটেছি শাশ্বত ভারতের কথা জানবার জন্যে। একে একে গুরুজী আমাদের দেবতা ঋষি ও অসুরের কথা শুনিয়েছেন। কাল সন্ধ্যাবেলায় শেষ হয়েছে অসুরের কথা। গুরুজী আজ থেকে কী বলবেন তা আমরা জানি নে। প্রাচীন সমাজে আর যে সব জাতি ছিল তাদের কথা কি তিনি বলবেন না!

পাধ্যে বললেন: আবার তোমাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। তোমার আজ কী হয়েছে বল তো!

আমার মনে হল যে পাধ্যে এখন অন্য কিছু সন্দেহ করছেন। এমন কিছু যা তিনি মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। লজ্জা পেয়ে বললুম ঃ যে কথা বার বার মনে পড়ছে তা শুনে আপনি হাসবেন।

পাধ্যে কঠিন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ যেন কোন অভিভাবকের দৃষ্টি। আমরা দুজনেই আশ্রমবাসী, আর সকলের সঙ্গে আমরাও অধ্যয়ন করি। কিন্তু পাধ্যে আমার উপরে অভিভাবকত্ব করেন অন্য কারণে। শুধু বয়সে প্রবীণ বলে নয়, অবসর সময়ে আমি তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়ি। শুধু আমি নয়, চেন্নুলু আর সুপ্তিও তাঁর কাছে সংস্কৃত পড়ে। সুপ্তি তাউজীর কন্যা, মাতৃহীন বলে এখনও চপল। আর তাউজীর উপরে আশ্রম পরিচালনার ভার। হৃষীকেশের অপর পারে গঙ্গার ধারে এই নতুন আশ্রমটি আমাদের সকলেরই ভাল লেগেছে। সবার সঙ্গে যেন একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠছে গড়ে। এই সম্পর্ককে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখেছি বলে উত্তর দিলাম ঃ দেবাসুরে যখন যুদ্ধ হত, তখন ঋষিরা যেমন দূরে থাকতেন তেমনি অপ্সরা গন্ধর্ব ও কিন্নরেরাও আকাশে থেকে যুদ্ধ দেখতেন। দেবতাদের জয় হলে তারা আনন্দে নৃত্য-গীত করতেন, পুষ্পবৃষ্টি করতেন আকাশ থেকে। এরা ছাড়াও ছিলেন নাগ যক্ষ বিদ্যাধর প্রভৃতি নানা জাতি। অথচ এঁদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

পাধ্যের মুখ সহসা প্রসন্নতায় ভরে গেল। বললেন ঃ আমি ভেবেছিলাম, মিসেস খুরানার জন্যে তোমার মন খারাপ করছে। ভাল হয়েছে তিনি চলে গিয়ে, আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আশ্রমের এই মহিলা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছিলেন। তাই পাধ্যের কথায় আমার অপরিসীম লজ্জা হল। বললাম ঃ আপনি কি এতক্ষণ তাই ভেবেছিলেন!

পাধ্যে তখনই বললেন ঃ আমার ভুল হয়েছিল।

তারপরেই বললেন ঃ তোমার ভাবনার কথা আমি গুরুজীর কানে পৌঁছে দেব।



পাধ্যে বোধহয় সত্যিই তাঁর কথা রেখেছিলেন। সায়াহ্নে উপাসনার মন্দিরে এসে গুরুজী প্রথমেই এই কথা বললেন : দেবতা অসুর ও ঋষি নিয়েই যে ভারতের প্রাচীন সমাজ সম্পূর্ণ ছিল না, এ কথা অনেকেরই মনে আজ দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষ তো ছিলই, তা ছাড়াও ছিল এমন অনেক জাতি যাঁরা দেবতা নন, অথচ দেবতার সঙ্গে সারাক্ষণ দেখা যেত। ইন্দ্রের সভায় তাঁদের দেখি, মানুষের মধ্যেও দেখি সহজ ভাবে বিচরণ করতে। আবার অসুরদের সঙ্গেও অনেকের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা আমার মনে পড়ল। ইন্দ্রের সভায় তারা নৃত্য-গীত করত, ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করতে আসত অপ্সরারা, উর্বশী বিবাহ করেছিল রাজা পুরূরবাকে, আবার গন্ধর্ব-কন্যা সরমার বিবাহ হয়েছিল রাক্ষস বিভীষণের সঙ্গে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দশ বৎসর সংসার করেছিলেন অপ্সরা মেনকার সঙ্গে, শকুন্তলা তাঁদের কন্যা। আর পাতালের নাগরাজ বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন জরৎকারু মুনি। তাঁদের পুত্র আস্তিক জনমেজয়ের সর্পসত্রে নাগবংশ রক্ষা করেছিলেন।

গুরুজী বললেন : এই সব জাতি দেবতাদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু অসুরভাবাপন্ন ছিল না। আবার তাদের স্থান ছিল সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধ্বে। তাদের পৃথক নাম ছিল এবং এক জাতির

সঙ্গে অন্য জাতিরও পার্থক্য ছিল অনেক। কোন সাধারণ নামে তাদের অভিহিত করা সম্ভব নয়।

তাউজী তাঁর খাতা পেনসিল নিয়ে একেবারে সামনে বসেছিলেন। নাকের উপরের রূপোর চশমাটা নামিয়ে বললেনঃ তাদের কি দেবেতর জাতি বলা যায় না? দেবতার চেয়ে নিচে ছিল তাদের স্থান।

গুরুজী এক মূহূর্ত ভাবলেন তারপরে বললেনঃ ইতর শব্দটি আমার ভাল লাগে না। তার চেয়ে উপদেবতা বললে ভাল শোনায়।

তাউজী তখনি শব্দটি লিখে নিলেন। কিন্তু আমার পাশে বসেছিল চেন্নুলু। সে চুপি চুপি বলল ঃ অপদেবতার কথাও শুনব।

বিরক্ত ভাবে আমি চেন্নুলুর মুখের দিকে তাকালুম। কিন্তু দেখলুম যে আর কেউ তার কথা শুনতে পান নি, গুরুজীর দিকেই সবাই চেয়ে আছেন।

গুরুজী বললেনঃ অমরকোষে একটি শ্লোক আছে। তার মানে বিদ্যাধর অপ্সরা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ ও ভূত—এই দশটি জাতি হল দেবযোনি।

কথা কটি টুকে নিতে নিতে তাউজী বললেনঃ সংস্কৃত শ্লোকটি বলবেন না?

হাসলেন গুরুজী, তারপরে বললেনঃ

বিদ্যাধরোঽপ্সরো যক্ষো রক্ষো গন্ধর্বকিন্নরাঃ।
পিশাচো গুহ্যকঃ সিদ্ধো ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ॥

সম্পূর্ণ শ্লোকটি তাউজী লিখতে পারলেন না, তাই মুখ তুলে তাকালেন গুরুজীর দিকে। গুরুজী আবার শ্লোকটি বললেন ধীরে ধীরে। আর তাউজী এবারে অনায়াসে তা টুকে নিলেন।

আমার মনে খানিকটা সন্দেহ উপস্থিত হল। গুরুজী যে দশটি জাতির কথা বললেন, তার মধ্যে যক্ষ রক্ষ পিশাচ ও ভূতের নাম আছে। ভূত পিশাচ শিবের অনুচর বলে হয়তো অপদেবতা নয়, কিন্তু যক্ষ রক্ষ তো রাক্ষসেরই নাম। রাক্ষসকে কেন দেবযোনি বলা হয়েছে বুঝতে পারলাম না। একবার ভাবলাম যে গুরুজীকে একটা

প্রশ্ন করে জেনে নিই, তারপরে মনে হল যে তিনি নিজেই হয়তো যথাসময়ে এ কথা বলবেন। তাই কোন প্রশ্ন না করে নীরবে চেয়ে রইলাম।

গুরুজী বললেনঃ যক্ষ ও রক্ষের জন্মকথা আমি অসুরের কথায় বলেছি। রামায়ণে মহর্ষি অগস্ত্য রামকে বলেছিলেন যে ব্রহ্মা তাঁর নিজের সৃষ্ট প্রাণীর রক্ষার জন্য কতগুলো জীবের সৃষ্টি করেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা ব্রহ্মার নিকটে এসে প্রশ্ন করে, আমরা কী করব? ব্রহ্মা বলেন, তোমরা মানুষদের রক্ষা কর। এই কথা শুনে তাদের মধ্যে কেউ বলল, রক্ষামঃ; আর কেউ বলল, যক্ষামঃ। তাই শুনে ব্রহ্মা বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা রক্ষামঃ বলেছ তারা রক্ষ ও যারা যক্ষামঃ বলেছ তারা যক্ষ হবে।

রক্ষ মানে আমি রাক্ষস জানি। যক্ষরাজ কুবের ও রাক্ষসরাজ রাবণ দুজনেই বিশ্রবা মুনির পুত্র, কিন্তু তাদের মাতা ভিন্ন। কুবেরের মাতা হলেন ঋষি ভরদ্বাজের কন্যা বরবর্ণিনী, আর সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী বা নিকষা হলেন রাবণের মাতা।

গুরুজী বললেনঃ রক্ষামঃ শব্দটি নিয়ে কোন বিবাদ নেই। রক্ষামঃ মানে আমরা রক্ষা করব। কিন্তু যক্ষামঃ শব্দটির অনেকে অনেক রকম মানে করেছেন। কেউ বলেন, যক্ষামঃ মানে আমরা পূজা করব; কেউ বলেন, আমরা পালন করব; আবার কেউ বলেন, আমরা ভক্ষণ করব। ক্ষুধার্ত জীবেরা ভক্ষণ করার কথাই হয়তো ভেবেছিল, কিন্তু কার্যত যক্ষেরা কোন মানুষ ভক্ষণ করে নি। রাক্ষসেরাই মাঝে মাঝে মানুষ ভক্ষণ করেছে বলে শোনা গেছে।

তাউজী বললেনঃ উপদেবতা শ্রেণীর রক্ষরা কী করে রাক্ষস-ভাবাপন্ন হল, সে কথা আমাদের জানা দরকার।

গুরুজী বললেনঃ তার আগে পদ্মপুরাণে বর্ণিত এদের জন্মকথাও জানা দরকার। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত আছেন। অন্ধকার হয়ে গেছে, ক্ষুধার্ত বোধ করছিলেন তিনি, ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তবু ক্ষান্তি নেই, সৃষ্টির মোহেই তিনি মত্ত হয়ে আছেন। এর ফলে বিকৃত

রূপ ক্ষুধার্ত প্রজার জন্ম হতে লাগল। আর এরাই উদ্যত হল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে। কিন্তু বাধা দিল অন্যরা, বলল, রক্ষতাং, রক্ষা কর। ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে যারা উদ্যত হয়েছিল, তাদের নাম হল যক্ষ, আর যারা তাঁকে রক্ষা করার কথা বলেছিল, তারা রক্ষ বা রাক্ষস নামে পরিচিত হল।

গুরুজী বললেন: ভাল করে বিচার করলে দেখা যাবে যে রাক্ষসদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীর রাক্ষসেরা যক্ষের মতো, নির্বিরোধী তারা, প্রাণীবিদ্বেষী নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাক্ষসেরা মহাবলশালী, দেবতাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল শক্তির পরীক্ষায়, মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার তারা করে নি। আর তৃতীয় শ্রেণীর রাক্ষসেরাই সত্যিকারের রাক্ষস, অর্থাৎ রাক্ষস বলতে আমরা যা বুঝি তাই। তারা নিশাচর, নিষিদ্ধ স্থানে তারা ঘুরে বেড়ায়, ঋষিদের যজ্ঞ নষ্ট করে আনন্দ পায়, আর সুযোগ পেলে মানুষ ভক্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। এই তৃতীয় শ্রেণীর রাক্ষসদের আমরা নিশ্চয়ই উপদেবতা বলব না, উপদেবতা বলব প্রথম শ্রেণীকে, যারা যক্ষের সঙ্গে সম পর্যায়ের।

তাউজী প্রশ্ন করলেন: দ্বিতীয় শ্রেণীর রাক্ষসদের কী বলবেন?

গুরুজী বললেন: সে তর্কের কথা। যেমন রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিতীয় না তৃতীয় শ্রেণীর রাক্ষস তেমনি। তবে আমি এদের অসুর গোষ্ঠীর বলে মনে করি। তাদের পরিচয়ও দিয়েছি অসুরদের সঙ্গে।

একটু থেমে বললেন: কোন পুরাণের মতে রাক্ষসেরা কশ্যপের পুত্র, দক্ষ প্রজাপতির কন্যা খসা তাদের মা। দৈত্য দানবেরাও তো কশ্যপের পুত্র, তাদের মাতাও দক্ষ প্রজাপতির অন্য দুই কন্যা দিতি ও দনু। কাজেই রাক্ষসদের এই জন্ম পরিচয়ও অগ্রাহ্য করা যায় না। এরা সবাই শক্তিমান ছিল, সবাই শত্রুতা করেছে দেবতাদের সঙ্গে। দেবতারা তাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতা কশ্যপ এবং দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতি তাঁদের মা। একই পিতার এতগুলি পুত্রের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত। বিবাদের মূল কারণ ছিল স্বর্গরাজ্যের

অধিকার। দেবতারাই স্বর্গরাজ্য চিরকাল ভোগ করবে তা হতে পারে না। তাই অন্য সব ভ্রাতারা সম্মিলিত ভাবে দেবতাদের আক্রমণ করত। অনেক সময়েই সার্থক হত তাদের অভিযান। সে সব কাহিনী অসুরের কথাপ্রসঙ্গে বলেছি।

প্রথম শ্রেণীর রাক্ষসদের মধ্যে কারও কথা আমাদের জানা আছে কিনা, তা জানবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু আমি কোন প্রশ্ন করব কিনা স্থির করবার আগেই গুরুজী বললেন: হেতি ও প্রহেতি নামে আমরা দুই রাক্ষসের নাম পাই। এরা দুই ভাই, আর এরাই বোধহয় প্রথম রাক্ষস যাদের নাম পাওয়া যায় পুরাণে। হেতি নাকি যমের এক ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেছিল, তাদের পুত্রের নাম বিদ্যুৎকেশ। সন্ধ্যা নামে এক রাক্ষসীরও পরিচয় পুরাণে পাওয়া যায়। সে কার স্ত্রী তা জানা যায় না, কিন্তু সালকটঙ্কটা নামে তার এক কন্যা ছিল। বিদ্যুৎকেশের সঙ্গে বিবাহ হয় এই সালকটঙ্কটার। রাক্ষসী সালকটঙ্কটা একটি সন্তানের জন্ম দিয়েই তাকে ত্যাগ করে। কিন্তু হরপার্বতীর কৃপায় সেই সন্তান অমরত্ব লাভ করে। আকাশে বিচরণ করবার সময় তাঁরা একটি নবজাত শিশুর কান্না শুনতে পেয়েছিলেন। পার্বতীর অনুরোধে শিব সেই শিশুকে মাতার সমান বয়স করে তাকে অমরত্ব দান করেন। এই পুত্র সন্তানের নাম হল সুকেশ। সুকেশকে বর দেবার সময় শিব বলেছিলেন যে তাঁর বরে রাক্ষসীরা সদ্য প্রসব করতেই সেই সন্তানের বয়স হবে মায়ের সমান। মহাভারতে ঘটোৎকচের জন্মের সময় আমরা তাই দেখেছি।

গুরুজী ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন: রাক্ষসের কথায় বলেছি কিনা আমার মনে নেই, এই সুকেশের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল এক গন্ধর্ব কন্যার। গ্রামণী নামে এক গন্ধর্ব যখন শুনলেন যে সুকেশ অমরত্বের বর পেয়েছে শিবের কাছে, তখনই তিনি তাঁর কন্যা দেববতীকে সুকেশের হাতে সম্প্রদান করেন। এঁদেরই তিন পুত্রের নাম মাল্যবান সুমালী ও মালী। এই তিন ভ্রাতাও কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে অজেয় হবার বর পেয়েছিলেন, আর বিবাহ করেছিলেন

নর্মদা নামে এক গন্ধর্বীর তিন কন্যা সুন্দরী কেতুমতী ও বসুদাকে।

বিশ্বকর্মা এঁদের জন্যে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ত্রিকূট ও সুকেশ পর্বতের মধ্যে লঙ্কাপুরী নির্মাণ করে দিয়েছিলেন এবং তিন ভাই সপরিবারে এই পুরীতে বাস করছিলেন। অগণিত পুত্রকন্যা হয়েছিল এঁদের। সুমালীর চার কন্যা রাকা কুম্ভীনসী পুষ্পোৎকটা ও কৈকসী। রাবণ কৈকসীর পুত্র। আর মালীর চার পুত্র বিভীষণের অমাত্য হয়েছিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাবণ যখন লঙ্কার রাজা, তখন শুধু তাঁর মাতামহ নয় সমস্ত মামারা তাঁর অমাত্য ছিলেন। সমগ্র মাতৃকুলে এমন একজন ছিলেন না যিনি সর্ববিষয়ে রাবণের সহায়তা করেন নি।

রাবণের জন্মের পূর্বেই মালীর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁরা তিন ভাই স্বর্গে গিয়ে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বিপর্যস্ত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুকে নিয়ে এলেন যুদ্ধের জন্য। বিষ্ণুর হাতে মালীর মৃত্যু হল এবং বিষ্ণুর ভয়েই ভীত হয়ে রাক্ষসেরা রসাতলে গিয়ে আশ্রয় নিল। আর শূন্য লঙ্কাপুরীতে বসবাস করতে এলেন বিশ্রবা মুনির পুত্র যক্ষরাজ কুবের।

একদিন সুমালী রসাতল থেকে বেরিয়ে জ্যোতির্ময় কান্তি কুবেরকে দেখতে পেলেন। তখনই এক ফন্দি এল তাঁর মাথায়। নিজের কনিষ্ঠা কন্যা কৈকসী তখনও অবিবাহিত, ভাবলেন যে বিশ্রবা মুনির সঙ্গেই তিনি এই কন্যার বিবাহ দেবেন। কিন্তু নিজে গেলে বিশ্রবা কিছুতেই রাজী হবে না ভেবে কন্যাকেই বললেন বিশ্রবার কাছে যাবার জন্য।

বিশ্রবা তখন মেরুগিরির পাশে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপস্যা করছিলেন। কৈকসী বিশ্রবার কাছে এলেন সায়াহ্নকালে, লজ্জাবনত মুখে ঋষির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখ মেলে এই রাক্ষস কন্যাকে দেখলেন ঋষি, প্রশ্ন করে তার পরিচয় জেনে নিলেন। তারপরে জানতে চাইলেন তার আগমনের কারণ। কৈকসী এ কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনি তপোবলে আমার মনের বাসনা জেনে

নিন। ধ্যানস্থ হয়ে ঋষি জেনে নিলেন সব কথা, বললেন, তুমি বড় অসময়ে এসেছ। তোমার সন্তান হবে রাক্ষসভাবাপন্ন। চোখের জলে কৈকসী বললেন, এর বিহিত আপনাকেই করতে হবে। সান্ত্বনা দিয়ে ঋষি বললেন, তোমার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাত্মা হবে। বিভীষণ এই কনিষ্ঠ পুত্র। চারিটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়েছিল কৈকসীর—রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ ও সূর্পনখা।

গুরুজী থামতেই তাউজী বললেন : আপনি কি বলতে চান যে অন্য সময়ে তাঁদের মিলন হলে রাবণ রাক্ষস না হয়ে ধর্মাত্মা হতেন!

গুরুজী বললেন : সায়ংকালে মিলনের ফল যে ভাল হয় না, তা কশ্যপও দিতিকে বলেছিলেন। তাঁদের সন্তান হয়েছিল বিখ্যাত অসুর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণকশিপু। কিন্তু রাবণ ধর্মাত্মা ছিলেন না, এ কথা আমি বলব না। পিতার কাছে তিনি বেদাধ্যয়ন করেছেন, কঠোর তপস্যা করেছেন দুই ভাইকে নিয়ে। পরবর্তী জীবনেও তাঁর ধর্মবোধ অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি।

তাউজী বললেন : তবে!

গুরুজী বললেন : রাবণের কথা তো আমরা অসুরের কথায় বলেছি। তাই থাক তার কথা। তার চেয়ে আজ আমরা যক্ষের কথা দিয়ে উপদেবতার কথা শুরু করি।

মনে মনে আমি বললাম : সেই ভাল।



প্রদীপের আলোয় আলোকিত আমাদের উপাসনার মন্দির, ধূপ ও ধুনার গন্ধে সুবাসিত। এই পরিবেশে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা শুনতে সত্যিই ভাল লাগে। যুক্তি দিয়ে কিছু যাচাই করবার ইচ্ছা হয় না, সরল বিশ্বাসে সবই সত্য বলে স্বীকার করি।

গুরুজী বললেনঃ যক্ষের অধিপতি ছিলেন কুবের, কিন্তু তিনি নিজে বোধহয় যক্ষ ছিলেন না। গুহ্যক কিন্নর প্রভৃতি জাতিরও তিনি অধিপতি ছিলেন। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসে কুবেরকে যক্ষরাজ বলা হয়।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে গুরুজী বললেনঃ নিঃসন্তান কৃপণ দেখলে আমরা বলি যে লোকটা মরে যখ বা যক্ষ হবে। ধনসম্পত্তি যারা পাহারা দেয়, তাদেরই আমরা যক্ষ বলি। কুবের ছিলেন ধনাধিপতি, তাঁর যক্ষ অনুচরেরাই ধনসম্পত্তি পাহারা দিত বলে এই রকমের একটা ধারণার উৎপত্তি হয়েছে।

তাউজী বললেনঃ কিন্তু কুবের কেন যক্ষ নন, সেই কথাটি বুঝিয়ে বলবেন কি?

সে অতি সরল কথা। তার জন্যে কোন গবেষণার দরকার নেই। বিশ্বের আদি ঋষিদের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য বিবাহ করেছিলেন রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভূকে। বিশ্রবা তাঁদের একমাত্র পুত্র। ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা বরবর্ণিনীকে ইনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁদেরই পুত্র হলেন কুবের। জন্মের অধিকারে কুবের ব্রাহ্মণ, কঠোর তপস্যায় তিনি

যে ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু—

বলে গুরুজী থামলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তাউজী বললেন: কিন্তু কী?

গুরুজী বললেন, কুবেরের রূপের কথা আমার মনে পড়ছে। বের মানে দেহ। অত্যন্ত কুৎসিত দেহ নিয়ে জন্মেছিলেন বলে বালকের নাম হয়েছিল কুবের। কুবেরের নাকি তিনটি পা ছিল। জন্মের পরে একটি পা খসে পড়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তাঁর দাঁতের সংখ্যাও ছিল মাত্র আট।

কুবেরের একটি ছবি আমি কোথায় দেখেছিলাম তা মনে করতে পারলাম না। সে ছবিতে আমি তিনটি পা দেখি নি। এই তিনটি পায়ের উল্লেখ কোথায় আছে, গুরুজী তা আমাদের বললেন না। তার বদলে গুরুজী আমাদের অন্য কথা বললেন: রামায়ণে কুবেরকে আমরা একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ রূপে দেখি। সুমালী রাক্ষস তাঁকে লঙ্কায় দেখেছিলেন। এই পুরুষকে দেখে ঈর্ষা জেগেছিল তাঁর। মনে মনে স্থির করেছিলেন যে কুবেরের পিতার সঙ্গে নিজের অনূঢ়া কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনিও এই রকম তেজস্বী এক দৌহিত্র লাভের চেষ্টা করবেন। এই কথা ভেবেই তিনি তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা কৈকসীকে পাঠিয়েছিলেন রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে বিশ্রবার কাছে। সার্থক হয়েছিল সুমালীর পরিকল্পনা। রাক্ষসকন্যা কৈকসীকে গ্রহণ করেছিলেন তপস্বী বিশ্রবা, রাবণাদির জন্ম হয়েছিল।

একটুখানি থেমে গুরুজী আবার বললেন: রামায়ণে আমরা কুবেরকে আর একবার দেখতে পাই জ্যোতির্ময় পুরুষ রূপে। পিতার আশ্রমে এলেন কুবের, পুষ্পক রথ থেকে তিনি নামলেন। কৈকসী রাবণকে বললেন, তোমার বৈমাত্রেয় ভাই কুবেরকে দেখ, যাতে তাঁর সমান হতে পার সেই চেষ্টা কর। এ কথায় হয়তো কোন ঈর্ষার বীজ ছিল না, কিন্তু রাবণের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হল। রাবণ উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি দুঃখ কোরো না মা, আমি তাঁর চেয়েও বড় হব।

কুবেরের রূপের কথা এখানে নেই। কিন্তু এই সব কথা পড়ে মনে

হয় না যে তিনি কুৎসিত দর্শন ছিলেন। দেহে তাঁর তিনটি পা থাকলে নিশ্চয়ই সে কথার উল্লেখ থাকত। অন্তত রাবণ অসঙ্কোচে কুবেরকে বড় বলে মেনে নিতেন না।

কুবেরের শৈশব সম্বন্ধে আমার কিছু জানা ছিল না। অনেকক্ষণ থেকেই এই ইচ্ছা আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু গুরুজীকে কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেলাম না। আমার চেয়ে যাঁরা বয়সে বড়, তাঁরাও নীরবে ছিলেন। আমি একবার পাখ্যের দিকে তাকালাম, আর একবার দণ্ডপানির দিকে। শকুন্তলাদির দিকেও তাকালাম একবার। তাঁরা কেউ কোন প্রশ্ন করে গুরুজীকে বিরক্ত করলেন না।

গুরুজী কিন্তু নিজেই বললেন: কুবের বড় হয়েছিলেন নিজের যোগ্যতায়। একদিন তিনি তপোবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই মনোরম স্থানে দিনকয়েক বাস করে তাঁর তপস্যা করবার বাসনা জাগল। তিনি আর কালক্ষয় না করে কৃচ্ছ্র সাধন শুরু করলেন। নানা ভাবে শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যায় দিন যাপন করতে লাগলেন। কখনও গাছের গলিত পত্র খেয়ে, কখনও শুধু বাতাসে উদর পূর্ণ করে, কখনও বা সম্পূর্ণ অনাহারে রইলেন। এমনি করে দু হাজার বছর কেটে গেল। তাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এলেন দেবতাদের সঙ্গে। বললেন, কুবের, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর নাও।

কুবের বললেন, যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন প্রভু, তাহলে এই বর দিন যে আমি যেন লোকপাল হতে পারি।

ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন: লোকপাল কী?

লোকপাল কথার মানে আমরা কেউই জানতাম না। গুরুজীর মুখে শুনলাম সেই কথা: লোকপালেরা হলেন পৃথিবীর রক্ষক বা অধ্যক্ষ। পৃথিবীর আট দিক রক্ষা করছেন আটজন দিকপাল, তাঁরাই লোকপাল বলে পরিচিত।

কে তাঁরা?

গুরুজী বললেন: উত্তর পূর্ব কোণের দিকপাল ছিলেন চন্দ্র, ইন্দ্র

পূর্বের। দক্ষিণ পূর্বে অগ্নি, যম দক্ষিণের, আর দক্ষিণ পশ্চিমের সূর্য। পশ্চিমের দিকপাল ছিলেন বরুণ, আর বায়ু উত্তর-পশ্চিমের। ব্রহ্মার বরে কুবের উত্তরের দিকপাল হলেন। এই সব দিকপালদের একটি করে হস্তী আছে। কুবেরের হস্তীর নাম সর্বভৌম।

পুষ্পক রথটিও কুবের ব্রহ্মার কাছে পেয়েছিলেন। লোকপাল হবার বর দেবার পরে ব্রহ্মা বলেছিলেন, আমি তোমাকে একটি রথ দিচ্ছি, এই রথে চড়ে তুমি আকাশ পথে যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারবে।

তাউজী প্রশ্ন করলেন ঃ কুবের ধনাধিপতি হলেন কেমন করে?

গুরুজী হেসে বললেন ঃ সেও ব্রহ্মার বরে। কেউ বলেন যে কুবেরের বুদ্ধি-চাতুর্যে বিস্মিত হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে এই বর দিয়েছিলেন, আবার কেউ বলেন যে কুবের এই বর লাভ করেছিলেন তপস্যার বলে। তাঁর প্রপিতামহ ব্রহ্মা তাঁকে দেবতার সম্মান দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাসস্থান নির্দেশ করে দেন নি। তাই বরলাভের পর কুবের তপোবন থেকে তাঁর পিতা বিশ্রবার কাছে এসে সমস্ত ঘটনা অকপটে নিবেদন করে বললেন, এবারে আপনি আমার বাসস্থান নির্দেশ করে দিন।

বিশ্রবা বললেন, বিশ্বকর্মা নির্মিত লঙ্কাপুরী এখন শূন্য পড়ে আছে, দেবতাদের ভয়ে রাক্ষসেরা আশ্রয় নিয়েছে রসাতলে। তুমি এখন লঙ্কাপুরীতে বাস কর।

পিতার আজ্ঞা পেয়ে রাবণ লঙ্কাপুরীতে গিয়ে রাজা হয়ে বসলেন। কিন্তু চিরকাল সেখানে থাকতে পারলেন না। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ বড় হয়ে লঙ্কাপুরীর অধিকার চাইলেন তাঁর মাতুল ও মাতামহের অনুরোধে। কুবের তাঁর সঙ্গে বিবাদ না করে পিতার কাছে ফিরে গেলেন। এবারে তাঁর বাসস্থান হল কৈলাসে। কুবেরের জন্য অলকাপুরী নির্মিত হল। যক্ষ কিন্নর ও গুহ্যকরা হলেন তাঁর অনুচর, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ তাঁর সভায় নৃত্যগীতের জন্য নিযুক্ত হলেন।

অলকাপুরীর নাম আমরা শুনেছি, শুনেছি সেখানকার নৃত্যসভার কথা। ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু যাত্রীরা যখন কৈলাসে যেতেন তীর্থ পরিক্রমায়, তখন তাঁরা কুবেরের অলকাপুরীর অন্বেষণও করতেন।

কালিদাসের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন চারিদিক, স্বপ্নে শুনতেন সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত। কৈলাসের পথ এখন ভারতবাসীর কাছে রুদ্ধ হয়ে গেছে। আবার হয়তো কোন দিন খুলবে।

গুরুজী বললেন ঃ কুবেরের সভার নাম বৈশ্রবনী। তপস্যার বলে তিনি এই সভা নির্মাণ করেছিলেন। তার আয়তন শত যোজন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সত্তর যোজন। শুভ বর্ণের এই সভায় সর্বদাই নৃত্য গীত হত। বিখ্যাত গন্ধর্বরা ছিলেন কুবেরের প্রিয় পারিষদ।

কুবেরের সভার বিস্তৃত বর্ণনা আছে মহাভারতের সভাপর্বে। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য সভা নির্মাণ করেছিলেন ময় দানব। এই প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছিলেন ইন্দ্র যম বরুণ কুবের ও ব্রহ্মার সভার কথা। নৃত্য গীতের জন্য যে সব গন্ধর্ব ও অপ্সরারা তাঁর সভায় আসতেন, তাঁদের নামও আমরা এই বর্ণনায় পাই। বিশ্বাবসু হাহা হূহূ তুম্বুরু পর্বত শৈলুষ চিত্রসেন চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্বের সঙ্গে আসতেন ইন্দ্রসভার অপ্সরা মিশ্রকেশী রম্ভা চিত্রসেনা শুচিস্মিতা চারুনেত্রা ঘৃতাচী মেনকা পুঞ্জিকস্থলা বিশ্বাচী সহজন্যা প্রম্লোচা উর্বশী ইরা বর্গা সৌরভেয়ী সমীচী বুদ্বুদা ও লতা। যক্ষ কিন্নর গুহ্যকরাও উপস্থিত থাকতেন, আর যাঁরা থাকতেন তাঁদের নাম হল মনিভদ্র ধনদ শ্বেতভদ্র কশেরক গণ্ডকণ্ডু প্রদ্যোত কুস্তুম্বুরু পিশাচ গজকর্ণ বিশালক বরাহকর্ণ তাম্রোষ্ঠ ফলকক্ষ ফলোদক হংসচূড় শিখাবর্ত হেমনেত্র বিভীষণ পুষ্পানন পিঙ্গল শোণিতোদ প্রবালক বাম্পনিকেত ও চীরবাসা।

এত সব নাম গুরুজী আমাদের বলেন নি, আমরা মহাভারত খুলে এই সব নাম টুকে নিয়েছিলাম। গুরুজী আমাদের বিশেষ ভাবে দুটি নাম বলেছিলেন, একটি বিভীষণের নাম ও অপরটি মহাদেবের। বিভীষণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলে এই সভায় নিয়মিত আসতেন, আর মহাদেব কুবেরের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন বলে পার্বতী ও অনুচরদের নিয়ে তিনিও আসতেন কুবেরের সভায়। দেবতা ও ঋষিরাও আসতেন। ইন্দ্রের সভার মতো কুবেরের সভাও গণ্যমান্য পারিষদে সমুজ্জ্বল ছিল।

গুরুজী বললেনঃ পুরাণে আমরা কুবেরের অনেকগুলি নাম পাই। তার মধ্যে একটি নামের বিশেষ তাৎপর্য আছে।

আমি তাউজীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তিনি তাঁর পেনসিলটি শক্ত করে ধরেছেন এবং নামটি শুনলেই তা লিখে নেবেন। আমরা সে সুযোগ পাই নে। প্রদীপের স্বল্প আলোয় সর্বত্র সমান দেখা যায় না। ছায়া পড়ে আশপাশ থেকে। কাজেই আমরা যথাসাধ্য মনে রাখবার চেষ্টা করি। ভুলে গেলে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিই সঙ্গীদের কাছ থেকে। তাই তাউজীর এই উৎসাহ দেখে আনন্দ পাই সকলে।

গুরুজী বললেনঃ এই নামটি হল একাক্ষী পিঙ্গলী। এর মানে এক চক্ষু পিঙ্গল নয়, দুটি চোখের একটি অন্ধ ও অপরটি পিঙ্গল। কুবের যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দেবী রুদ্রানীকে তিনি দৈবাৎ দেখে ফেলেছিলেন এবং এতেই তাঁর ডান চোখ দগ্ধ ও বাম চোখ ধূলিকলুষিত ও পিঙ্গল হয়ে যায়। কুবের আরও কঠোর তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের প্রীতিলাভ করেন। মহাদেবই তাঁর নাম দিয়েছিলেন একাক্ষী পিঙ্গলী। বলেছিলেন, তোমার মতো কঠিন তপস্যা করতে আমি আর কাউকে দেখি নি। তপস্যায় তুমি আমার সমান হয়েছ, এখন থেকে তুমি আমার সখা হলে।

তারপর কুবের ফিরে এলেন তাঁর নিজের গৃহে। শুনলেন যে রাবণ অত্যাচারী হয়ে উঠেছেন এবং দেবতা ও ঋষিরা তাঁর বিনাশের কথা চিন্তা করছেন। এই সংবাদ শুনে কুবের দুঃখিত হয়েছিলেন। রাবণ তাঁর ভাই। তাই তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য দূত পাঠালেন লঙ্কায়।

কুবেরের দূত লঙ্কায় এসে সসম্মানে রাবণকে বললেন, মহারাজ, আপনার ভাই কুবের বলেছেন যে এত দিন ধরে অনেক দুষ্কর্ম করেছেন, এখন সচ্চরিত্র হয়ে ধর্মাচরণ করুন।

রাবণ এই উপদেশের কথা শুনেই ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। বললেন, ভেবেছিলাম যে বড় ভাই গুরুজন, তাকে বধ করা উচিত নয়। কিন্তু তার এই ধৃষ্টতা আমি ক্ষমা করব না। তোমাকে ও তাকে দুজনকেই

মরতে হবে। বলে খড়্গের আঘাতে দূতকে বধ করলেন। তারপরে আস্ফালন করে বললেন, এবারে আমি সব লোকপালকে যমালয়ে পাঠিয়ে ত্রিলোক জয় করব। বলে তাঁর সচিব ও সেনাদল নিয়ে কৈলাসের দিকে যাত্রা করলেন।

কৈলাস পর্বতে যুদ্ধ হয়েছিল কুবেরের সঙ্গে রাবণের। রাবণকে বাধা দেবার জন্য যক্ষরা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। তারপর কুবেরের সেনাপতি মণিভদ্র সহস্র যক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু মায়াবী রাক্ষসদের নিকট তাঁরা পরাজিত হলেন। শেষে কুবের নিজে এলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। রাবণকে বললেন, দুর্মতি, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে কথা তুমি শোন নি। এর পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে।

দুজনের যুদ্ধ হল প্রবল। শেষ পর্যন্ত রাবণ গদাঘাতে কুবেরকে ভূপাতিত করলেন। তাঁর মন্ত্রীরা কুবেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথটি অধিকার করে ত্রিভুবন জয়ের জন্য যাত্রা করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ দুটি ঘটনায় দুই ভাই-এর চরিত্র পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। কঠোর তপস্যা করে রাবণরা তিন ভাই ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছিলেন। তারপরে তাঁরা ফিরে আসতেই রাবণের সঙ্গে প্রথম বিবাদ হয়েছিল কুবেরের। হত না। মাতামহ সুমালী ও মাতুল প্রহস্ত এই বিবাদ বাধিয়েছিলেন। সুমালী রাবণকে বলেছিলেন, তুমি ব্রহ্মার কাছে বর পেয়েছ, এবারে আমাদের লঙ্কাপুরী অধিকার করে রাক্ষসদের রাজা হও। কিন্তু রাবণ বলেছিলেন, কুবের আমাদের গুরুজন, তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত হবে না। রাবণের উত্তর শুনে সুমালী আর কিছু বলেন নি, কিন্তু তাঁর পুত্র প্রহস্ত নিরস্ত হন নি। ভাগিনেয়কে একদিন বললেন, দেখ, বীরের এই ভ্রাতৃপ্রেমের কোন মানে হয় না। দেবতা ও অসুরও তো ভ্রাতা, পুরাকালে তাঁরা কী করেছিলেন ভাবো! রাবণ সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারেন নি। খানিকক্ষণ চিন্তা করে মামাকে বলেছিলেন, আমি বড় ভাইএর সঙ্গে

বিবাদ করতে চাই নে। তবে আপনি কুবেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারেন। লঙ্কা রাক্ষসদের রাজধানী ছিল, ধর্মরক্ষার জন্য এই পুরী তাঁর ফেরত দেওয়া উচিত।

প্রহস্তের মুখে এই কথা শুনে কুবের বললেন, লঙ্কাপুরী রাক্ষসশূন্য দেখেই আমার পিতা আমাকে এই পুরীতে বাস করতে বলেছিলেন। আমার যত্নে এখন এখানে অনেক রাক্ষস বসবাস করছে। তবে রাবণ যদি আসতে চায় তো আমার আপত্তি নেই। সে নির্বিঘ্নে এই রাজত্ব ভোগ করতে পারে।

তারপরে কুবের পিতাকে সব কথা জানিয়েছিলেন। বিশ্রবা মুনি সব শুনে বলেছিলেন, দুর্মতি রাবণ একবার আমার কাছেও এই প্রস্তাব করেছিল। আমি তাকে এই লোভ ত্যাগ করতে বলেছিলাম। কিন্তু যখন সে তা পারে নি, তখন তার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়। ব্রহ্মার বরে সে প্রবল হয়েছে, তোমারই লঙ্কা ত্যাগ করা ভাল। আমার ইচ্ছা যে তুমি কৈলাসে গিয়ে বসবাস কর।

কুবের আর দ্বিধা না করে সপরিবারে কৈলাসে চলে গেলেন। আর রাবণ সদলবলে এসে লঙ্কার অধিপতি হয়ে বসলেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেন্ঃ এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই ভাই-ই বিবাদ এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল একজন দূতের জন্য। প্রকাশ্য রাজসভায় তার বলা উচিত হয় নি যে কুবের তাঁর দুষ্কর্মের নিন্দা করে সচ্চরিত্র হয়ে ধর্মাচরণ করতে বলেছেন। যে কোন মানী লোক এতে অপমানিত বোধ করবেন। এই অপমানের জন্য কুবেরকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য রাবণের ছিল না। কুবেরকে যুদ্ধে পরাজিত করেই তিনি মনে করলেন যে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কারও উপরে তিনি কোন অত্যাচার করেন নি, ধনাধিপতির ধনরত্নও স্পর্শ করেন নি। শুধু তাঁর দিগ্বিজয়ের সুবিধার জন্যই পুষ্পক রথটি সংগ্রহ করে কৈলাস ত্যাগ করেছিলেন।

ব্রহ্মার বরে কুবের অমর হয়েছিলেন। তাই আমরা তাঁকে মহা-

ভারতের যুগেও দেখতে পাই। কুবেরের কথা মনে পড়ছে তো?

বলে গুরুজী সবার দিকেই একবার তাকালেন। কিন্তু উত্তর আমরা কেউই দিলাম না। মহাভারতে যে কুবেরের কথা আছে, এ কথা আমি জানতামই না। অনেকেই জানতেন না। তাই তাউজী বললেন : গল্পটা আপনি বলুন।

গুরুজী বললেন : মহাভারতের বনপর্বে আছে এই গল্প। পাণ্ডবরা যখন বদরিকাশ্রমে বাস করছিলেন, তখন একদিন একটি সহস্রদল পদ্ম উড়ে এসে দ্রৌপদীর সামনে পড়ল। এই সুন্দর সুগন্ধযুক্ত দিব্য পদ্মটি দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, ভীম, আমি যদি তোমার প্রিয়া হই তবে এই রকমের আরও অনেক পদ্ম আমার জন্যে সংগ্রহ করে নিয়ে এস।

আমি আশ্চর্য হলাম একটি কথা শুনে। দ্রৌপদী ভীমকে ভীম বলে সম্বোধন করছেন। ভীম তাঁর স্বামী। আধুনিক কালে সম্বোধনের এই রীতি বেশ প্রচলিত হয়েছে, স্ত্রীরা স্বামীকে আজকাল নাম ধরেই ডাকছেন। কিন্তু এই রীতি এখনও সর্বজন স্বীকৃত নয়, অনভ্যস্ত কানে এখনও কটু মনে হয়। যাঁরা একটু প্রাচীনপন্থী, তাঁরা এই রকম সম্বোধন অত্যন্ত অপছন্দ করেন। এখনও তাঁরা 'ওগো' 'শুনছ' বলে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। মহাভারতের যুগে স্ত্রীরা যে স্বামীকে নাম ধরে ডাকতেন, সে কথা বোধহয় তাঁরা জানতেন না।

কিন্তু গুরুজী এ সব আলোচনা করলেন না, বললেন : দ্রৌপদীর অনুরোধেই ভীম বেরোলেন পদ্মবনের সন্ধানে। তিনি যখন গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন, তখন আমরা দেখতে পাই যে যক্ষ ও গন্ধর্ব নারীরা তাদের স্বামীর পাশে বসে নানা ভঙ্গীতে বলবান পুরুষ ভীমকে দেখেছিলেন অদৃশ্য ভাবে। তারপর গন্ধমাদন পেরিয়ে ভীম সেই দিব্য নদীর তীরে পৌঁছেছিলেন। কৈলাস শিখর ও কুবের ভবনের নিকটে এই নদীতেই ফোটে স্বর্ণময় সহস্রদল পদ্ম। আর তা রক্ষা করে কুবেরের অনুচর ক্রোধবশ নামে রাক্ষসের দল। ভীমকে দেখে তারা বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, কুবের এখানে ক্রীড়া করেন, মানুষের এখানে আসার অধিকার নেই। তুমি যক্ষরাজের অনুমতি নাও।

ভীম বললেন, যক্ষরাজকে তো দেখতে পাচ্ছি না, আর দেখলেও আমি অনুমতি চাইতে পারি না। ভিক্ষা চাওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। আর নদীর উৎপত্তি যখন পর্বত শিখর থেকে, তখন সকলেরই এখানে সমান অধিকার। বলে ভীম পদ্মবনে নামলেন। তাই দেখে রাক্ষসেরা তেড়ে এল, যুদ্ধ করল ভীমের সঙ্গে। কিন্তু সেই যুদ্ধে শতাধিক রাক্ষস ভীমের হাতে মরবার পরে বাকী সবাই পালিয়ে গিয়ে কৈলাসে কুবেরকে এই সংবাদ দিল। কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি। পদ্ম নিয়ে ভীম ফিরে যাক।

একটি পুরনো শাপের কথা কুবেরের মনে হয়েছিল। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁদের শাপ দিয়েছিলেন। দেবতাদের মন্ত্রণাসভা বসবে কুশবতী নগরীতে, নিমন্ত্রণ পেয়েছেন ধনাধিপতি কুবের। অনুচরদের নিয়ে তিনি সেখানে যাচ্ছিলেন আকাশপথে। সহসা দেখতে পেলেন যে যমুনার তীরে মহর্ষি অগস্ত্য উগ্র তপস্যায় নিরত আছেন। অগ্নির মতো তেজোময় ঋষি সূর্যাভিমুখে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দণ্ডায়মান। এই দৃশ্য দেখে তাঁর প্রিয় সখা মনিমানের কী ভাব এসেছিল তিনিই জানেন, থুথু ফেলেছিলেন সেই তপস্বীর মাথায়। মনিমানের মোহ মূর্খতা বা দর্প অগস্ত্য ক্ষমা করেন নি, শাপ দিয়েছিলেন কুবেরকে। বলেছিলেন যে তাঁর দুরাত্মা সখা মনিমান সসৈন্যে মরবে মানুষের হাতে। আর যার হাতে তারা মরবে তাকে দেখেই কুবেরের এই শোক দূর হবে। তার আগে তিনি পাপমুক্ত হবেন না।

ভীমের সঙ্গে তাই যক্ষদের যুদ্ধ হল না। পদ্ম আহরণ করে ভীম নির্বিঘ্নে ফিরে গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বাক্য তো মিথ্যা হবার নয়। তাই আর একবার বিবাদ বাধল ভীমের সঙ্গে। এবারেও ভীম অগ্রসর হয়েছিলেন দ্রৌপদীর কথায়।

বদরিকাশ্রম থেকে পাণ্ডবেরা গন্ধমাদন পর্বতের নিকট বৃষপর্বার আশ্রমে এসেছিলেন, সেখান থেকে কৈলাসের দিকে যাত্রা করলেন। মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করে তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। স্থির করলেন যে এইখানেই

তাঁরা অর্জুনের জন্য অপেক্ষা করবেন। ঋষি আর্ষ্টিষেণ তাঁদের আশ্রয় দিলেন।

কিছুদিন থাকবার পর একদিন দ্রৌপদী ভীমকে বললেন পর্বত-বাসী রাক্ষসদের তাড়াবার কথা। তাঁকে উত্তেজিত করবার জন্য বললেন, খাণ্ডববন দাহনের সময় অর্জুন কী করেছিলেন মনে আছে! শুধু নাগ গন্ধর্ব ও রাক্ষস নয়, ইন্দ্রকেও নিবারিত করেছিলেন। তুমি এখানকার রাক্ষসদের তাড়াতে পারবে না? তাহলে আমরা এই সুন্দর পাহাড়ের ওপরটা দেখতে পাব।

দ্রৌপদীর এই কথায় ভীম ক্ষেপে উঠলেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠলেন পাহাড়ের মাথায়। এই পাহাড় থেকেই দেখা যায় কুবের-ভবন, কাঞ্চন ও স্ফটিকে নির্মিত প্রাসাদ সোনার প্রাচীরে বেষ্টিত। ভীম এই দৃশ্য দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপরে শঙ্খধ্বনি করে শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দেখতে দেখতে যক্ষ গন্ধর্ব ও রাক্ষসেরা এল তেড়ে। কিন্তু ভীমের হাতে মারা পড়ল অনেকে, আর বাকি সবাই পালিয়ে গেল। তারপরে কুবেরের সখা মনিমান এলেন শক্তি শূল ও গদা নিয়ে। যুদ্ধে ভীম তাঁকে গদাঘাতে বধ করলেন।

যুদ্ধের শব্দ পেয়ে যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে এলেন। ভীম অনেক রাক্ষস মেরেছেন দেখে বললেন, ভীম, তুমি নিতান্ত হঠকারিতার বশে অকারণে এত রাক্ষস বধ করেছ, দেবতারা এতে রাগ করবেন। এমন কাজ তুমি আর কোরো না।

যুধিষ্ঠিরের এই কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মনে হল যে ঠিক এই রকমের কথা আমি আগে কখনও শুনি নি। রাক্ষস বধ করলে দেবতারা রাগ করবেন, যুধিষ্ঠিরের মুখে এই কথা শুনে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। গুরুজী বললেনঃ এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুবের রাক্ষসদেরও অধিপতি ছিলেন। লঙ্কায় তিনি রাক্ষসদের উপরে আধিপত্য করেছেন, কৈলাসেও রাক্ষসেরা তাঁর প্রজা। যুদ্ধের প্রয়োজন হলে রাক্ষসেরাই সকলের আগে যেত, যক্ষরা বোধ হয় প্রহরী ছিল তাঁর ধনাগারের। গন্ধর্বরাও অগ্রসর

হত, কিন্তু কিন্নর গুহ্যক ও বিদ্যাধররা যুদ্ধ করত বলে মনে হয় না।

এই কথা সত্য বলে মেনে নিলে রক্ষ বা রাক্ষসদের দেবযোনি বলে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। রক্ষকে আমরা রক্ষী বলে মনে করতে পারি। তারাও কুবেরের অনুচর ছিল এবং দেবতারা তাদের প্রীতির চক্ষে দেখতেন।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি ঘটনা মনে পড়ল। এও দ্বাপর যুগের ঘটনা। পাণ্ডবদের বনবাস কালে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করে আনা হয়েছিল। দুর্গম হিমালয়ে ঘটোৎকচ ও তার অনুচরেরা সবাইকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে গেছে। পাণ্ডবদের এই পুত্রের মৃত্যুতে সবাই যখন শোকে মুহ্যমান, তখন কেবল কৃষ্ণ আনন্দে নৃত্য করেছিলেন।

আমার মনে হল যে কৃষ্ণ নিজে ছিলেন রাক্ষসবিদ্বেষী। ছলে বলে কৌশলে তিনি সারাজীবন ধরে রাক্ষস বধ করিয়েছিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই সত্য কথা বলেছেন ভীমকে, অকারণে রাক্ষস বধ করলে দেবতারা রাগ করবেন।

গুরুজী বললেন: ভীমের দ্বিতীয়বার রাক্ষস বধের খবর যখন কুবেরের কানে পৌঁছল, তখন তিনি রেগে গেলেন, পুষ্পক রথে চেপে এলেন গন্ধমাদন পর্বতে।

পুষ্পক রথের উল্লেখ শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। গুরুজী এখন দ্বাপরের ঘটনা বলছেন। তার অনেক আগে ত্রেতাযুগে রাবণ এসে কুবেরের এই পুষ্পক রথটি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাবণ বধ করবার পরে রাম এই পুষ্পক রথে চেপে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। তারপর রথটি লঙ্কার রাজা বিভীষণের কাছে ছিল, না কুবেরের কাছে ফিরে গিয়েছিল, তা আমাদের জানা নেই। তবে বিভীষণ যে বড় ভাই কুবেরের সভায় আসতেন মাঝে মাঝে সে কথা আমরা শুনেছি। তবে কি বিভীষণ এই রথটি কুবেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন!

এ প্রশ্ন আর কারও মনে এসেছিল কিনা জানি নে, কেউই কোন প্রশ্ন করল না। গুরুজী বললেন: পাণ্ডবেরা পরমাশ্চর্যে দেখলেন যে

যক্ষ রাক্ষস পরিবেষ্টিত প্রিয়দর্শন কুবের নামলেন পুষ্পক রথ থেকে।

মুখ তুলে তাউজী বললেন ঃ প্রিয়দর্শন !

গুরুজী সহাস্যে বললেন : হ্যাঁ, মহাভারতে তাঁকে প্রিরদর্শন বলা হয়েছে। আকাশপথে অপরূপ রথে তিনি উড়ে এসে নামলেন, যেমন সুন্দর রথ তেমনি সব অশ্ব, রথের আসনে তিনি যখন যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব অপ্সরা পরিবৃত হয়ে বসলেন, তখন তাঁকে প্রিয়দর্শন বলতেই হবে।

আমার বিপদ আরও বাড়ল। পুষ্পক রথ কি অশ্ববাহিত ছিল ! আমি আর স্থির থাকতে না পেরে গুরুজীকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি তার আগেই বললেন ঃ নকুল সহদেবকে নিয়ে যুধিষ্ঠির এসে কুবেরকে প্রণাম করলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করলেন নিজেদের অপরাধের জন্য। কিন্তু ভীম সশস্ত্র শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে। কুবের যুধিষ্ঠিরদের দেখলেন, দেখলেন ভীমকেও। কিন্তু রাগ করলেন না কারও উপরে। প্রসন্ন মনে বললেন, তোমাদের উপরে আমার রাগ নেই, ভীম আমাকে পাপমুক্ত করেছে। বলে অগস্ত্যের শাপের কথা শোনালেন যুধিষ্ঠিরকে। তার পরে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন, ভীমকে তুমি শাসনে রেখো। সে নির্ভীক বটে, কিন্তু গর্বিত অসহিষ্ণু বালবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞানহীন। তোমরা রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গিয়ে বাস কর, যক্ষ কিন্নর ও গন্ধর্বরা তোমাদের রক্ষা করবে ও তোমাদের জন্য আহার্য ও পানীয় এনে দেবে। কুবেরের কথা শুনে ভীম আত্মসমর্পণ করলেন, কুবেরকে প্রণাম করে তাঁর পায়ে রাখলেন সমস্ত অস্ত্র। ভীমকে আশীর্বাদ করলেন কুবের, বললেন, শত্রুর গৌরব নাশ করবে তুমি, আর বন্ধুর আনন্দ বর্ধন করবে। বলে অন্তর্হিত হলেন। পাণ্ডবেরা নেমে এলেন পাহাড়ের উপর থেকে ঋষির আশ্রমে।

গুরুজী বললেন : ধনাধিপতি কুবের ছিলেন সমস্ত ধনের প্রদাতা। কিন্তু তাঁকে আমরা বিলাসী বা ভোগী রূপে কোথাও দেখি না। তপস্যা করে তিনি লোকপাল হয়েছেন, ধনাধিপতিও হয়েছেন দেবতার বরে। যক্ষ রক্ষ কিন্নর বিদ্যাধর ও গুহ্যকদেরও তিনি অধিপতি। ইচ্ছা করলেই

তিনি বিলাসব্যসনে গা ঢেলে দিতে পারতেন। তার বদলে তিনি পঞ্চাশ হাজার বছর তপস্যা করে শিবের সখা হয়েছেন। সংসার করেছেন স্ত্রীপুত্রকন্যাকে নিয়ে। তাঁর স্ত্রীর নাম আহুতি, দুটি পুত্র— নাম নলকূবর ও মণিগ্রাব, আর মীনাক্ষী তাঁর একমাত্র কন্যা।

আপন তপস্যা বলে তিনি এক শ্বেতবর্ণ সভা নির্মাণ করেছিলেন। নৃত্য গীতে এই সভা সর্বদাই মুখর থাকত; অপ্সরা ও গন্ধর্বরা আসতেন অমরাবতী থেকে। কুবের যে সত্যিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ তুম্বুরু গন্ধর্বকে তিনি শাপ দিয়েছিলেন কর্তব্যে অবহেলার জন্য। অপ্সরা রম্ভার প্রতি ছিল তুম্বুরুর অপরিসীম আসক্তি। এই জন্যই তার কর্তব্যের ত্রুটি হয়েছিল। কুবের তার অপরাধ ক্ষমা করেন নি। শাপ দিয়েছিলেন যে তার রাক্ষস জন্ম হবে। ত্রেতাযুগে তুম্বুরু জন্মেছিলেন বিরাট রাক্ষস রূপে, রামায়ণে তাঁর শাপমুক্তির গল্প আছে।

গুরুজী থামলেন একটুখানি, তারপরে বললেন: কুবেরেরও কিছু আসক্তি ছিল একজন অপ্সরার প্রতি, তার নাম বর্গা।

বর্গা নামের কোন অপ্সরার কথা আমি শুনি নি। গুরুজীও সেই কথা বললেন: উর্বশী মেনকার মতো নাম নেই অপ্সরা বর্গার, কুবেরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কোন পরিচয়ও আমরা পাই নে। শুধু মহাভারতের আদি পর্বে আমরা এই অপ্সরার নাম দেখতে পাই। বনবাসী অর্জুন মণিপুর থেকে এসেছিলেন সৌভদ্র তীর্থে। তপস্বীদের বারণ না শুনে অর্জুন জলে নামতেই এক কুমীর তাঁর পা টেনে ধরল, সবলে অর্জুন সেই কুমীরকে টেনে ডাঙায় তুললেন, আর অমনি সেই একটি সুন্দরী নারী হয়ে গেল। তারপরে পরিচয় দিল নিজের, বলল, আমি কুবেরের প্রিয়া, অপ্সরা বর্গা। চার সখীর সঙ্গে গিয়েছিলাম ইন্দ্রলোকে, ফেরার সময় আমাদের শাপ দিলেন এক বেদাধ্যয়নরত ব্রাহ্মণ। নির্জনে সেই রূপবান ব্রাহ্মণকে দেখে আমরা তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে এই শাপ পেয়েছি। আপনি আমার সখীদেরও উদ্ধার করুন।

বর্গার কথা শুনেছিলেন অর্জুন। শাপমুক্ত হয়ে অপ্সরারা ফিরে গিয়েছিলেন।



প্রদীপের মৃদু আলোয় চোখে নেশা ধরেছে, ধূপ ধুনার গন্ধে ঘন হয়ে উঠছে সেই নেশা। কুবেরের কাহিনী যে শেষ হয় নি, তা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। তাই নীরবে অপেক্ষা করছিলাম পরবর্তী কথার জন্যে। কিন্তু গুরুজী আর কুবেরের কথা বললেন না, বললেন তাঁর পরিবারের কথা। আমরা কতকটা হতাশ হলাম।

গুরুজী বললেনঃ কুবেরের স্ত্রীর নাম আহুতি, কিন্তু আহুতির পিতৃপরিচয় মনে পড়ছে না।

বলে তিনি ভাবতে লাগলেন।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পরে তাউজী বললেনঃ থাক আহুতির কথা, পরে আপনার কাছে জেনে নেব।

সেই ভাল।

বলে গুরুজী নিশ্চিন্ত হয়ে বললেনঃ কুবেরের দুটি পুত্র ও একটি মাত্র কন্যা। নলকূবর ও মণিগ্রীব তাঁর দুই পুত্র, আর কন্যা হল মীনাক্ষী। এদের সম্বন্ধেও কোন কাহিনী আমার মনে পড়ছে না।

মীনাক্ষী নামটি আমার শোনা মনে হচ্ছিল। আর দূর থেকে দণ্ডপাণি সেই কথা বলে ফেললেনঃ মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির আছে।

গুরুজী হেসে বললেন : সে মীনাক্ষী কুবেরের কন্যা নন, তিনি পার্বতী, সুন্দরেশ্বর শিবের ঘরণী তিনি।

গুরুজীর কথা শুনে দণ্ডপাণি বোধহয় লজ্জা পেলেন। আর কোন কথা বললেন না।

তাউজী বললেন : নলকূবর নামটিও কি আমাদের শোনা নয় ?

নলকূবর নাম আমার শোনা। রাবণের কথা বলবার সময় গুরুজী আমাদের বলেছিলেন মনে ছিল না। কিন্তু এইবারে মনে পড়ল। এঁরা নলকুবের না বলে নলকূবর কেন বলছেন, তা বুঝতে পারলাম না। গুরুজী বললেন : এই নামটি আমরা রামায়ণে পড়েছি। কী প্রসঙ্গে পড়েছি তা বোধহয় বলেছি তোমাদের।

গল্পটি তাউজীর মনে পড়ল না, গুরুজীর মুখের দিকে তিনি নিঃশব্দে তাকালেন।

গুরুজী বললেন : বর্গা যেমন কুবেরের প্রিয়া ছিলেন, তেমনি রম্ভা ছিলেন নলকূবরের প্রিয়া। অমরাবতীর কাজ শেষ হলে তিনি আকাশপথে চলে আসতেন অলকাপুরীতে। নলকূবরের নিকটে ছিল তার নিয়মিত অভিসার।

মুহূর্তে আমার সমস্ত গল্পটি মনে পড়ে গেল। শুধু আমার নয়, আরও কয়েকজনের যে মনে পড়ে গেছে তাতে সন্দেহ রইল না। চোখেমুখে লজ্জা দেখেই আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম।

কিন্তু তাউজীর বোধহয় কিছু মনে পড়ে নি, তাই বললেন : তারপর ?

গুরুজী বললেন : যাঁরা রামায়ণ পড়েন হৃদয়ে প্রবল ভক্তি নিয়ে, নলকূবরকে তাঁরা দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন।

কেন ?

দশানন রাবণকে তিনি শাপ দিয়েছিলেন বলেই লঙ্কার অশোক বনেও সীতা পবিত্র থাকতে পেরেছিলেন।

অসুরের কথায় গুরুজী এই গল্পটি আমাদের বলেছিলেন।—রাবণ চলেছেন স্বর্গরাজ্য আক্রমণের জন্য। কৈলাস পর্বতে করেছেন শিবির

স্থাপন। রাত্রে সৈন্যসামন্তরা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘুম আসে নি রাবণের। তিনি বাহিরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। চাঁদ উঠেছে, সেই আলোয় ফুলের বাহার দেখা যাচ্ছে, আর শীতল বাতাস বইছে অল্প অল্প। দূর থেকে কিন্নরীদের গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছে। এমনি সময় রাবণ স্বর্গের অপ্সরা রম্ভাকে দেখতে পেলেন, তিনি চলেছেন অভিসারিকার বেশে। রাবণ তাঁর হাত ধরে বললেন, এমন সময় তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি ত্রিলোকপতি রাবণ, আমার কাছে তুমি খানিকক্ষণ থেকে যাও।

ভয় পেয়ে রম্ভা বললেন, আমি আপনার পুত্রবধূ, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন। তারপরে নিজের সম্বন্ধটা বুঝিয়ে বললেন, আমি আপনার ভাই কুবেরের পুত্র নলকূবরের কাছে যাচ্ছি।

রাবণ হেসে বললেন, তুমি তাঁর একনিষ্ঠা স্ত্রী হলে তোমাকে পুত্রবধূ বলে সম্মান করতেই হত। কিন্তু তোমাদের তো পতি নেই, আর দেবতারাও এক স্ত্রীতে আবদ্ধ থাকেন না। বলে রাবণ সবলে রম্ভাকে কাছে টানলেন।

রম্ভার কাছে এই বলপ্রয়োগের কথা শুনে রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন নলকূবর, সবলে কোন নারীকে গ্রহণ করলে তাঁর মাথা সপ্তধা ভেঙে পড়বে।

গুরুজী এই গল্পটি আর শোনালেন না, শুধু বললেন ঃ নলকূবরের শাপের জন্যই রাবণ সীতাকে অশোক বনে রেখেছিলেন, তাঁকে বশে আনবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন বলপ্রয়োগ করেন নি।

এই শাপের কথায় বড় আশ্চর্য লাগে আমার। কে শাপ দিতে পারে, আর কে পারে না, তা আমার জানা নেই। রম্ভা স্বর্গের অপ্সরা, কিন্তু তিনি রাবণকে শাপ দিতে পারেন নি। শাপ দিয়েছিলেন নলকূবর। তিনি যক্ষরাজের পুত্র, জাতে ব্রাহ্মণ। তপস্যা করে শাপ দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু রাবণ তাঁর শাপের কথা জেনে ভয় পেয়েছিলেন।

আর একজন নারীও শাপ দিয়েছিলেন রাবণকে, তাঁর নাম বেদবতী। একাকী নির্জনে তাঁর তপস্যার কথা রামায়ণে লিপিবদ্ধ আছে।

গুরুজীকে এই প্রশ্ন করলেন শকুন্তলাদি, বললেনঃ সে যুগের মেয়েরা কি শাপ দিতে পারত না ?

স্মিত মুখে গুরুজী তাকালেন শকুন্তলাদির দিকে। শকুন্তলাদি বোধহয় লজ্জা পেলেন, বললেনঃ আমি অপ্সরা রম্ভার কথা জানতে চাইছি। রাবণের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে তিনি নলকূবরের কাছে নালিশ করেছিলেন। তিনি নিজে কি তাঁকে শাপ দিতে পারতেন না ?

গুরুজী বললেনঃ না পারবার কোন কারণ দেখি নে। অর্জুনকে যদি উর্বশী শাপ দিতে পারেন তো রম্ভা কেন পারবেন না !

জানি না কে বলে উঠলেনঃ অর্জুনকে শাপ দিয়েছিলেন উর্বশী !

গুরুজী বললেনঃ মহাভারতে এই গল্প আছে। অস্ত্র শিক্ষার জন্য অর্জুন গিয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছে। আর ইন্দ্র উর্বশীকে পাঠিয়েছিলেন অর্জুনের মনোরঞ্জনের জন্য। উর্বশী অভিসারিকার বেশে অর্জুনের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু অর্জুন তাঁকে প্রণাম করে বলেছিলেন, তুমি আমাদের মা, আমাদের আদিপুরুষ পুরূরবার স্ত্রী ছিলে তুমি। তোমাকে আমি প্রণাম করছি, তুমি ফিরে যাও। এই অপরাধেই উর্বশী অর্জুনকে শাপ দিয়েছিলেন, তুমি নপুংসক হও। বিরাট রাজার গৃহে নপুংসক বৃহন্নলা রূপে অর্জুন এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন।

তাউজী বললেনঃ এই কাহিনী আপনি বড় সংক্ষেপে বললেন।

গুরুজী বললেনঃ উর্বশীর কথায় এ কাহিনী সবিস্তারে বলব। এখন যক্ষের কথা বলি।

গুরুজী ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেনঃ আর কোন নতুন কথা মনে পড়ছে না। যক্ষ বা গুহ্যক, কারও কথাই মনে পড়ছে না।

তাউজী বললেনঃ গুহ্যক নাম আমি এর আগে কোনদিন শুনি নি।

গুরুজী বললেনঃ সত্যিই এ নাম খুবই অপ্রচলিত। এদের

সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানি যে এরাও ছিল কুবেরের অনুচর। যক্ষ কিন্নর বিদ্যাধরদের মতো অলকাপুরীতে গুহ্যকরাও কুবেরের সেবা করত। এদের বিশেষ কাজ ছিল কুবেরের নিধিরক্ষা। এদের আবাস-স্থল পিশাচলোকের উপরে ও গন্ধর্বলোকের নিচে।

তাউজী বললেন: কোন বিশিষ্ট গুহ্যকের নাম বা কার্যকলাপ—

বাধা দিয়ে গুরুজী বললেন: মনিভদ্র প্রভৃতি যক্ষকে গুহ্যক বলা হত জানি, এ ছাড়া এই জাতির সম্বন্ধে আর কোন তথ্য আমার জানা নেই। নিধিরক্ষা মানে বোধহয় ধনভাণ্ডার রত্নভাণ্ডার পাহারা। আর কী কাজ করত বা কী রকমের কাজে এদের অনুরাগ ছিল সে সম্বন্ধে কোনখানে কিছু পাই নি।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: কিন্নর বা বিদ্যাধর সম্বন্ধেই কি আমরা বেশি কিছু জানি! একজনেরও নাম জানি নে, কোন গল্প জানি নে কারও সম্বন্ধে। শুধু এইটুকু জানি যে কিন্নররা সুকণ্ঠ ছিল, আর সুদর্শন ছিল বিদ্যাধররা। সেইজন্যেই আমরা মিষ্টি গলা শুনলে বলি কিন্নর কণ্ঠ, আর রূপসী কন্যাকে বলি রূপে বিদ্যাধরী। খানিকটা ব্যঙ্গ মিশ্রিত হলেও এ প্রবাদ খুবই প্রচলিত।

গুরুজীর কথায় তাউজী বোধহয় ভয় পেলেন, বললেন: এমন সংক্ষেপে বললে উপদেবতার কথা যে এক দিনেই ফুরিয়ে যাবে।

গুরুজী হেসে বললেন: ফুরোবে না। আমাদের পুরাণে এত কথা আছে যে সারা জীবন ধরে বললেও সে কথা ফুরোবে না।

কিন্তু—

সে কথা উপদেবতার হবে না ভাবছ? এক উর্বশীর জীবন নিয়েই একখানা গ্রন্থ রচিত হতে পারে। আর এরা ছাড়াও তো আরও অনেক জাতি আছে, যারা মানুষ নয়, অসুর বা দেবতাও নয়। প্রচলিত ধারণায় তাদের উপদেবতাও বলা চলে না।

হাতের পেনসিল খাতার উপরে নামিয়ে রেখে তাউজী গুরুজীর মুখের দিকে তাকালেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। সহাস্যে গুরুজী বললেন: নাগ বানর ভল্লুক বললে আমরা একটা ভ্রান্ত ধারণার

সম্মুখীন হই। নাগরাজ বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেছিলেন যাযাবর ঋষি জরৎকারু, আস্তিকমুনি তাঁদের পুত্র। তেমনি নাগকন্যা উলুপীকে অর্জুন বিবাহ করেছিলেন। নাগজাতি একটি প্রাচীন জাতি, তারা নিশ্চয়ই সাপ ছিল না। তেমনি ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা জাম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন কৃষ্ণ। জাম্ববতী নিশ্চয়ই ভালুক ছিলেন না।

গুরুজীর কথা শুনে সুপ্তি হেসে উঠল। আমাদেরও কৌতুক বোধ হয়েছিল কিছু। বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রাচীন ভারতের সকল জাতিকে আমরা আজও আবিষ্কার করতে পারি নি।

গুরুজী বললেনঃ কিন্নরদের কথাই প্রথমে দেখা যাক। তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে নরাকৃতি ছিলেন না। কেউ বলেন যে তাঁদের নরমুখ ও অশ্বের দেহ ছিল, কিন্তু উল্টোটাই সবাই সত্য বলে মনে করেন। তাঁদের দেহ ছিল নরাকৃতি ও মুখ অশ্বের মতো। অশ্বের সঙ্গে কিছু মিল ছিল বলেই হয়তো এই বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা যে বিখ্যাত গায়ক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

একটু থেমে গুরুজী বললেনঃ কিন্নররা কৈলাসবাসী ছিলেন, কুবের ছিলেন তাঁদেরও রাজা। তাউজীর দিকে চেয়ে বললেনঃ রামায়ণে এঁদের উল্লেখ আছে।—

শোভয়ন্তি চ তদ্দেশম্ ভ্রমমাণা বরস্ত্রিয়ঃ।
যথা কৈলাস শৃঙ্গাণি শতশঃ কিন্নরীগণাঃ॥

তৎপর ভাবে তাউজী এই শ্লোকটি টুকে নেবার চেষ্টা করতেই গুরুজী হেসে বললেনঃ এতে নতুন কোন কথা নেই। বরং হিমালয় প্রদেশে অন্বেষণ করলে আজও কিন্নর জাতির সন্ধান পাওয়া যাবে। বাঙলার যশোর জেলারও একটি সঙ্গীতপ্রিয় জাতি নাকি নিজেদের কিন্নর জাতীয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তেমনি বিহারে গন্ধর্ব জাতির নাম শোনা যায়। এ সব অনুসন্ধানের বিষয়।

গুরুজী কিছু ভাবছিলেন। তারপরে বললেনঃ কিন্নরদের জন্ম সম্বন্ধে একাধিক বিবরণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে তাঁদের উৎপত্তি

ব্রহ্মার ছায়া থেকে। মৎস্য পুরাণে অন্য কথা আছে। কিন্নররাও কশ্যপের পুত্র, অরিষ্টা তাঁদের মাতা। বায়ুপুরাণের মতে এঁরা অশ্বমুখের সন্তান, নানা গণে বিভক্ত তাঁরা। শ্রীমদ্ভাগবতে কিম্পুরুষ নামেও একটি জাতির উল্লেখ আছে। কিন্নরদের মতো তাঁদেরও জন্ম ব্রহ্মার ছায়া থেকে। কুৎসিত দর্শন বলে নাম কিম্পুরুষ। কিন্তু তাঁরাও দেবযোনি। কৈলাসে তাঁরা বিচরণ করেন ও কুবের তাঁদেরও রাজা।

আমার মনে হল যে কিম্পুরুষ কোন স্বতন্ত্র জাতি নয়। কুৎসিত বলে কিন্নরদেরই বোধহয় কিম্পুরুষ বলা হত। মুখ যাদের ঘোড়ার মতো, কুৎসিত তাদের বলতেই হবে। কিংবা অশ্বমুখের সন্তান বলেই হয়তো ঘোড়ার মতো মুখ বলা হয়েছে। আসলে অশ্বমুখ নাম।

গুরুজী বললেন : কয়েকটি বিষয়ে কিন্নরদের সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই। সেটি হচ্ছে যে এঁরা ছিলেন হিমালয়বাসী, যক্ষরাজ কুবেরের অনুচর ও সঙ্গীতপ্রিয়। গুহ্যকরাও কুবেরের অনুচর, কিন্তু তাদের বাস ছিল পিশাচলোকের উপরে ও গন্ধর্বলোকের নিচে গুহ্যকলোকে।

বিদ্যাধররা পৃথিবীবাসী নয়, আকাশেও নেই তাদের স্বতন্ত্রলোক। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে এদের বাসস্থান।

বিদ্যাধরদের সম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে পড়ল। গুরুজী সেই গল্পটি আমাদের ইন্দ্রের কথায় বলেছিলেন। বিদ্যাধর বধূরা বিচরণ করছিলেন সমন্ত্যক বনে। মহর্ষি দুর্বাসাকে সেই পথে যেতে দেখে তাঁরা একটি সন্তানক ফুলের মালা দিয়েছিলেন দুর্বাসার হাতে। দুর্বাসা তা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে সেই মালাটি তিনি দেবরাজকে উপহার দিয়েছিলেন। দেবরাজ সেই মালা নিজের গলায় না পরে রেখেছিলেন ঐরাবতের কুম্ভের উপরে। শুঁড় দিয়ে ঐরাবত সেই মালা নামিয়ে লাঞ্ছনা করেছিল মালার। দুর্বাসা অপমানিত বোধ করেছিলেন, শাপ দিয়েছিলেন দেবরাজকে। সেই শাপেই তিনি শ্রীভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

গুরুজী এই বিদ্যাধরদের কথা খুবই সংক্ষেপে বললেন : বিদ্যাধররা ইন্দ্রের অনুচর ছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁদের রাজা ছিলেন না। শোনা

যায় যে বিদ্যাধরদের নিজেদেরই রাজা ছিল। তাঁর নাম ছিল চক্রধর্মা। তাঁকেও কুবেরের সভায় দেখা যেত ও তাঁরাও কুবেরের পরিচর্যা করতেন। মানুষের সঙ্গেও তাঁদের বিবাহ হত বলে শোনা যায়।

আমার মনে হয় যে মানুষের সঙ্গে বিবাহে বোধহয় কোন জাতিরই বাধা ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তী দশ বৎসর সংসার করেছিলেন তপস্বী শুক্রাচার্যের সঙ্গে। বানাসুরের কন্যা উষাকে বিবাহ করেছিলেন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। অপ্সরা উর্বশী পুরূরবার রাণী হয়েছিলেন। এমন বিবাহের উদাহরণ পুরাণে অনেক আছে।

গুরুজী বললেন: সে যুগের মানুষ নিকৃষ্ট জীব বলে নিন্দিত ছিল না। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র রাজা পুরূরবার সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তারপর অসুরদের ভয়ে তিনি যখন আত্মগোপন করেছিলেন, তখন রাজা নহুষ দেবরাজ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বর্গরাজ্যে আরও অনেক দেবতা ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাউকে রাজা না করে পৃথিবী থেকে নহুষকে দেবতারা নিয়ে গিয়েছিলেন। এ কম গৌরবের কথা নয়।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ হল। ভাবলাম, সত্যিই তো! অসুরদের ভয়ে ইন্দ্র আত্মগোপন করেছেন, সে তাঁর নিজের কৃতকর্মের ফল। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের কোন বিবাদ নেই। কাজেই কোন দেবতা বসতে পারতেন স্বর্গের শূন্য সিংহাসনে। কিন্তু তা হল না। পৃথিবী থেকে নহুষ গেলেন স্বর্গরাজ্য শাসন করতে। পাত্রমিত্র হয়ে বসলেন স্বর্গের দেবতারা। সত্যিই ভারি আশ্চর্য লাগে এ কথা ভাবতে।

গুরুজী বললেন, শ্রীমদ্ভাগবতে একজন বিদ্যাধরের কথা আছে। তাঁর নাম চিত্রকেতু। তিনি ছিলেন শূরসেন দেশের রাজা। দেবর্ষি নারদের নিকটে বিদ্যার উপদেশ নিয়ে তিনি বিদ্যাধর হয়েছিলেন। বিমানে তিনি আকাশ পথে বিচরণ করতেন। একদিন কৈলাসে হর-পার্বতীর বিরাগভাজন হয়ে অভিশপ্ত হন। তার ফলে তাঁর অসুর জন্ম হয়। বৃত্রাসুর তাঁর নাম।

তাউজী বললেন, অসুরের কথায় এ গল্প তো আপনি বলেন নি!

বলি নি বুঝি!

বলে গুরুজী আমাদের চিত্রকেতু বিদ্যাধরের গল্প বললেন।

চিত্রকেতু ছিলেন শূরসেন অর্থাৎ মথুরা মণ্ডলের রাজা। তাঁর রাণীর সংখ্যা এক কোটি, কিন্তু সন্তান একটিও নেই। রাজা সর্বগুণে অলঙ্কৃত হয়েও সর্বদা বিষণ্ণ থাকতেন। একদিন ভ্রমণ রত ঋষি অঙ্গিরা তাঁর নিকটে এসে এই বিষণ্ণতার কারণ জানতে চাইলেন। চিত্রকেতুর দুঃখের কথা শুনে অঙ্গিরা ত্বষ্টা দেবতার যজ্ঞ করে পাক করা চরু খেতে দিলেন বড় রাণী কৃতদ্যুতিকে। তাঁর ছেলে হল, রাণীর আদর বাড়ল। আর অন্য রাণীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছেলেকে বিষ দিলেন। মরে গেল সেই শিশু রাজপুত্র। বড় রাণী কেঁদে কেটে আকুল হলেন। রাজার শোকও গভীর। তাই দেখে সান্ত্বনা দিতে এলেন অঙ্গিরা ও নারদ। অঙ্গিরা দিলেন আত্মতত্ত্বের উপদেশ। আর নারদ বললেন, এই বিদ্যার উপদেশ নাও, সাত দিনের মধ্যে তুমি ভগবান সঙ্কর্ষণের দর্শন পাবে। নারদ চিত্রকেতুকে সেই বিদ্যা দিয়ে গেলেন। চিত্রকেতু এক সপ্তাহ ধরে শুধু জলপান করে সেই বিদ্যা ধারণ করলেন। সাত রাত অতিবাহিত হবার পরেই তিনি বিদ্যাধরদের আধিপত্য লাভ করলেন। অনন্তেরও দর্শন পেলেন।

এরপর বিদ্যাধর চিত্রকেতু বিমানে আকাশ পথে যেতে যেতে কৈলাস শিখরে হর-পার্বতীকে দেখলেন সিদ্ধ ও চারণে পরিবেষ্টিত। শিব দেবীকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। তাই দেখে চিত্রকেতু হেসে বললেন, ইনি এইভাবে সভায় বসে আছেন! ইতর হলেও তো নির্জনে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়! আরও অনেক অসঙ্গত কথা বলতে দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, ইনিই কি জগতে নির্লজ্জ ও দুষ্টদের দণ্ডধারী হয়ে শিবকে শাসন করতে এসেছেন! বলে সেই ধৃষ্টতার দণ্ড দিলেন অভিশাপ দিয়ে, তোমার অসুর জন্ম হবে।

অভিশপ্ত চিত্রকেতু প্রত্যভিশাপ দিলেন না। বিমান থেকে নেমে দেবীকে প্রণাম করে বললেন, আপনার অভিশাপ আমি আমার

অঞ্জলিতে গ্রহণ করলাম। এতো আমার পূর্বের কর্মফল। আমি শাপ মোচনের জন্য আপনাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করছি না। আমার উক্তি আপনি অনুচিত মনে করেছেন বলে ক্ষমা চাইছি। এই বলে চিত্রকেতু চলে গেলেন।

শিব বললেন, এই চিত্রকেতু হরির প্রিয় অনুচর। ইনি শান্ত সমদর্শী বলে পরিচিত।

শাপগ্রস্ত বিদ্যাধর চিত্রকেতুই ত্বষ্টার যজ্ঞে অবিভূর্ত হয়েছিলেন। তিনিই বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত।



এর পরে ভূত পিশাচ সিদ্ধদের কথা।

বলে গুরুজী বাহিরের দিকে তাকালেন। গভীর অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়ছে পৃথিবী। গুরুজী বললেন, আজ কি এই পর্যন্তই থাকবে ?

তাউজী বললেন ঃ এদের সম্বন্ধে কি অনেক কিছু জানবার আছে?

মাথা নেড়ে গুরুজী বললেন ঃ না। এদের সম্বন্ধে কোন বিবরণই পাওয়া যায় না।

তবে আজই বলুন।

বলে তাউজী জাঁকিয়ে বসলেন।

গুরুজী একটু ভেবে বললেন ঃ সংস্কৃতে ভূতম্ ক্লীবলিঙ্গ ও ভূতঃ পুংলিঙ্গ। ভূতম্ মানে সত্য, আবার জন্তু ও পিশাচাদিও বোঝায়।

কিন্তু ভূতঃ দেবযোনিবিশেষ। স চ অধোমুখোর্ধ্বমুখাদি পিশাচভেদো রুদ্রানুচরো বালগ্রহঃ ইত্যমরভরতৌ। এরা অধোমুখ ও উর্ধ্বমুখ পিশাচভেদ, রুদ্রের অনুচর বালগ্রহ। ভাগবতে এদের বর্ণনা আছে—

এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ॥

এই বর্ণনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তারা সুদর্শন নয় এবং তাদের রূপ দেখলে ভয়ই করে। তবু তাদের দেবযোনি বলা হল কেন সেই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায় না।

একটু থেমে তিনি বললেনঃ পিশাচদের সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা চলে। তারা যক্ষ ও রাক্ষসদের চেয়ে নিকৃষ্ট, তারা মরুদেশ নিবাসী ও অত্যন্ত অশুচি।

যক্ষো বৈশ্রবণস্তদানুচরাশ্চ, রক্ষাংসি রাবণাদীনি,
পিশাচাস্তেভ্যো অপকৃষ্টা অশুচিমরুদেশনিবাসিনঃ।

কথ্য ভাষায় পিশাচকে পিচাশ বলা হয়। এই শব্দটিও সংস্কৃত অভিধানে আছে। পিচাশ ইতি ভাষা। ইত্যমরঃ। পিশাচদের লোক হল—

অন্তরীক্ষচরা যে চ ভূতপ্রেত পিশাচকাঃ।
বর্জয়িত্বা রুদ্রগণাংস্তু তত্রৈব চরন্তি হি॥

সহসা গুরুজী তাউজীর দিকে চেয়ে হাসলেন। তাউজী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই শ্লোকগুলি টুকে নেবার চেষ্টা করছিলেন।

আমি আজ আশ্চর্য হচ্ছিলাম অন্য কথা ভেবে। গুরুজী সাধারণতঃ সংস্কৃত শব্দ পরিহার করবার চেষ্টা করেন। যেটুকু বলেন তা নিতান্তই প্রয়োজনীয় কিংবা সেই শ্লোকের কাব্যমাধুর্যের জন্য উল্লেখ করেন। অনেক সময়ে তার অর্থও আমাদের বলে দেন। কিন্তু আজ আমি এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখছিলাম, আর তার কারণ বুঝতে না পেরেই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।

তাউজী মুখ তুলে তাকাতেই গুরুজী বললেনঃ এ সব কথা টুকে নেবার কোন প্রয়োজন নেই। এ সব উদ্ধৃতি থেকে বেশি কিছু জানা

যাবে না। তবু বলছি এই জন্যে যে যদি কারও বেশি জানবার আগ্রহ থাকে তবে তাকে এই কথা কয়টি মূলধন করে গবেষণা করতে হবে। মরুদেশবাসীকে পিশাচ বলি, আর তিব্বতীকে কিম্পুরুষ, ভূত কোন্ অঞ্চলবাসী তাও অনুসন্ধানের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমার গন্ধর্ব ও কিন্নরদের কথা মনে পড়ল। মহাভারতের যুগে গান্ধার নামে একটা দেশ ছিল। সেই দেশের মানুষকেই গন্ধর্ব বলত কিনা কে জানে। কিন্নর দেশ নামে হিমালয়ের একটা অঞ্চল এখনও পরিচিত। এই অঞ্চলবাসী সেকালের কিন্নর কিনা তাও আমাদের জানা নেই। মনে হল যে এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধান করলে হয়তো কিছু ফল পাওয়া যাবে। গুহ্যক বিদ্যাধর প্রভৃতি শব্দেরও একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়।

গুরুজী বললেন: ভূত ও পিশাচ শব্দ আমাদের বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে এখনও সঞ্জীবিত আছে। দেবতা বিশেষের পূজার পূর্বে ভূতশুদ্ধির বিধান আছে। দেহস্থিত পাপপুরুষকে ভূতশুদ্ধির দ্বারা দগ্ধ করতে হয়, তারপর চন্দ্রগলিত সুধায় নূতন দেহ নির্মাণ করে পূজারম্ভ। পিশাচের কথা আছে শুদ্ধিতত্ত্বে। অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে মৃতের আত্মার উদ্দেশে যদি বৃষদান করা না হয়, তবে শত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানেও সেই আত্মার মুক্তি নেই। তাকে পিশাচ হতে হয়।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: এর থেকে একটি সন্দেহ কি মনে আসছে না! পিশাচ যদি দেবযোনি হত তাহলে অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা হত না। দেবযোনি পাবার জন্যে লোকে পিশাচ হবারই চেষ্টা করত।

তাউজী এবারে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন: ভূত পিশাচেরা কি তাহলে দেবযোনি নয়?

গুরুজী বললেন: কঠিন প্রশ্ন। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে আমি বলেছি যে এরা দেবযোনি। আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে তাদের নিন্দার কথাও বলেছি। দেহস্থিত পাপপুরুষকে দগ্ধ করার নাম ভূতশুদ্ধি, আর মৃতের আত্মা যাতে পিশাচ না হয় তার জন্যে

বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।

শ্রাদ্ধের সময় প্রেতের কাজ যে সবাই করেন তা জানি। এই প্রেত আর পিশাচে বোধহয় প্রভেদ নেই।

গুরুজী বললেন: আরও একটা কথা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। ভূত প্রেত বা পিশাচ হল শিবের অনুচর। শিবের অনুচরকে আমরা সম্মান করব, না অসম্মান!

বলে গুরুজী তাউজীর মুখের দিকেই তাকালেন।

তাউজী বললেন: সম্মান করাই উচিত।

তাহলে তাদের দেবযোনি বলতে আপত্তি নেই। রূপের কথা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। তাই না?

তাউজী মাথা নেড়ে মেনে নিলেন।

গুরুজী হেসে বললেন: তাহলে এমন লোক আমরা দেখি না কেন যিনি মরবার আগে বলে যান, আমি শিবের অনুচর হতে চাই, আমার জন্যে বৃষোৎসর্গ কোরো না!

তাউজী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না।

গুরুজী বললেন: আমার মনে হয় যে রাক্ষস ভূত ও পিশাচকে দেবযোনি বলা উচিত হবে না। নাগ বানর প্রভৃতি জাতি যেমন উপদেবতা নয় মানুষও নয়, তেমনি ভূত ও পিশাচকেও আলাদা রাখা উচিত। রাক্ষসকে আমরা অসুর বা দৈত্যের সমপর্যায়ের মনে করতে পারি, কিন্তু উপদেবতা ভাবতে পারি না।

তাউজী বললেন: এদের জন্মবিবরণ বলবেন না?

গুরুজী বললেন: কিছু বলি নি বুঝি?

মাথা নেড়ে তাউজী বললেন: না।

গুরুজী বললেন: বেদের কোন ব্রাহ্মণে আছে যে ব্রহ্মা এদের সৃষ্টি করেছিলেন অসুর ও রাক্ষসদের সঙ্গে। মহাভারতেও এই কথা আছে। ব্রহ্মার যে জলবিন্দু থেকে দেবতা গন্ধর্ব ও মানুষের উৎপত্তি, সেই জলবিন্দুর অন্য কয়েক ফোঁটা থেকে রাক্ষস ও পিশাচের জন্ম।

মনু বলেন যে এরা প্রজাপতির সৃষ্টি। কিন্তু পুরাণের অন্য মত। সেই প্রচলিত মতানুসারে পিশাচেরাও কশ্যপের সন্তান, তাদের মায়ের নাম ক্রোধবসা। রাক্ষসদের চেয়েও এদের স্থান নিচে, এরা ঘৃণিত প্রাণী। শ্মশানে মশানে এরা ঘুরে বেড়ায়, শবাহার করে ও মানুষকে বিপথে চালিত করে এরা আনন্দ পায়।

তাউজী বললেনঃ আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে তো সব মিলে যাচ্ছে। তবে এদের দেবযোনি কেন বলব!

গুরুজী হেসে বললেনঃ সেইটি বিবেচনার বিষয়। ভাল করে না জেনে কোন প্রচলিত মতকে অস্বীকার করা অর্বাচীনের কাজ। যাদের কৌতূহল আছে, তাদের জন্যে তো অনুসন্ধানের পথও খোলা আছে।

বলে গুরুজী থামলেন। বুঝতে পারলাম যে ভূত ও পিশাচের কথা শেষ হয়ে গেল, এবারে নূতন কোন প্রসঙ্গ আরম্ভ হবে।

প্রদীপের মৃদু আলোয় আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। পাধ্যেকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছে, আর জ্বলজ্বল করছে দণ্ডপাণির চোখের দৃষ্টি। শকুন্তলাদিকেও বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে। কিন্তু কারও মুখে কোন কথা নেই। যাদের মনে প্রশ্ন এসেছে নানারকম, তারাও নীরবে আছেন। কাল তারা গুরুজীর সঙ্গে দেখা করে এই সব প্রশ্নের উত্তর জেনে নেবেন, কিন্তু এখানে বিরক্ত করবেন না। আমার মনে কোন প্রশ্ন আছে কিনা আমি ভেবে পেলাম না। কিন্তু মন আমার অতৃপ্ত। মনে হল যে আরও অনেক জানবার কথা আমাদের জানা হল না।

অনেকক্ষণ পরে গুরুজী কথা কইলেন, বললেনঃ ভূত পিশাচের পরে সিদ্ধদের কথা। সিদ্ধ ও সাধ্যরা দেবতা নন, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁদের দেবগণ বলা হয়েছে। এরা অণিমা লঘিমা প্রভৃতি গুণযুক্ত।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ অণিমা লঘিমা কী?

গুরুজী সহাস্যে বললেনঃ যৎ প্রভাবাৎ দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ সূক্ষ্মীভূয় সর্বত্র বিচরন্তি কৈশ্চিদপি ন লক্ষ্যন্তে। যোগের প্রভাবে এঁরা লঘু হয়ে

সূক্ষ্মশরীরে অদৃশ্য ভাবে দেবতাদের মতো সর্বত্র বিচরণ করেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় আমরা সিদ্ধগণকে দেখতে পাই। দেবতাদের সঙ্গে তাঁরাও দেবসভায় স্থান পান, সকলের সম্মানের পাত্র তাঁরা। দুর্গোৎসবে সিদ্ধগণেরও পূজার বিধান আছে।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে এল। যে সব প্রাণী দেবযোনি বলে পরিচিত, তাদের সকলেরই মধ্যে এমন কিছু ক্ষমতা আছে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। এই সব ক্ষমতার মধ্যে প্রধান হল সূক্ষ্ম শরীরে যথেচ্ছ বিচরণ। যেমন দেবতা ও সিদ্ধরা তেমনি ভূত পিশাচ ও রাক্ষসেরাও ইচ্ছামতো দেহ ধারণ করে বা অদৃশ্য হয়ে সর্বত্র যাতায়াত করতে অক্ষম। দেহ তাদের বাধা নয়, আকাশে তাদের অবাধ লীলা। মানুষ এই ক্ষমতার অধিকারী ছিল না, কোনকালে কেউ এই ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিল কিনা তাও জানা যায় না। রাজা পুরূরবা ইন্দ্রের সভায় যেতেন, বিমানের মতো তাঁর রথ ছিল। অর্জুন অমরাবতী গিয়েছিলেন ইন্দ্রের রথে চেপে। কিন্তু গন্ধর্ব অপ্সরাদের মতো মানুষের আকাশ ভ্রমণের কথা পুরাণে পাওয়া যায় না। আমার মনে হল যে এই ক্ষমতার অধিকারী যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই বলা হত দেবযোনি। দৈব ক্ষমতার অধিকারী বলেই তাঁদের উপদেবতা নাম। হোক তাঁরা কুৎসিত ও ঘৃণার পাত্র, কিন্তু অমানুষিক ক্ষমতার অধিকারী তো! মানুষের মধ্যেও তো নরাধম আছে, তাদের দিয়ে সকল মানুষের বিচার হয় না।

বড় আনন্দ হল মনে। একটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর যেন পেয়ে গেছি। উপাসনা মন্দিরের বাতিগুলো এখন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

গুরুজী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন: আজ এই পর্যন্তই থাক।

এ কথা শুনে আমরাও উঠে পড়লাম।



সকালবেলায় পাধ্যে এসে আমাকে ডাকলেন, বললেন : আর কত ঘুমোবে ?

ধড়মড় করে আমি উঠে বসলাম।

চেন্নুলুও অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু পাধ্যে তার দিকে তাকালেন না। বললেন : সকালে শুয়ে থাকলে আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। এই আলস্য সারা দিন শরীরকে কাবু করে রাখে।

বাইরে বেরিয়ে আমি দেখলাম যে ভোরের আলো তখন সবে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, আর পাহাড়ের গায়ে আছে কুয়াশার মতো মেঘ ঘনিয়ে। দিনের আলোয় অন্ধকার দূর হতে আরও কিছু সময় লাগবে। পাধ্যে আমার দিকে চেয়ে বললেন : একি, এমন করে বেরিয়ে এলে কেন! গায়ে একটা চাদর জড়াও।

শিরশিরে শীতল হাওয়ায় শরীর আমার কেঁপে উঠেছিল। আমি কোন কথা না বলে ঘরের ভিতর থেকে গরম চাদরখানা জড়িয়ে এলাম।

পাধ্যে বললেন : চল একটু বেড়িয়ে আসি।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম : কোথায় ?

পাধ্যে একটু হেসে বললেন : ভয় নেই, নিরুদ্দেশের যাত্রা নয়। শুধু বেড়াবার জন্যেই খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসব।

আশ্রমের এলাকার বাহিরে আমরা বেরিয়ে এলাম। তারপর নেমে গেলাম গঙ্গার ধারে। সেই পুরনো গঙ্গা, কিন্তু কী অপরূপ তার রূপ। যেন নতুন কোন নদী বলে এখন মনে হচ্ছে। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই রূপ দেখতে লাগলাম।

কতক্ষণ আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা জানি নে, আর কতক্ষণ পাধ্যে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন তাও বুঝতে পারি নি। লজ্জা পেলাম পাধ্যের মন্তব্য শুনে। তিনি বললেন: আবার ঘুমিয়ে পড়লে!

চমকে উঠে বললাম: না।

তবে!

এই গঙ্গাকে সেই গঙ্গা বলে মনে হচ্ছে না।

পাধ্যে হেসে বললেন: এই পৃথিবীকে সেই পৃথিবী মনে হচ্ছে তো?

আমি আবার চলতে শুরু করলাম। পাধ্যের পরিহাসের কোন জবাব দিলাম না।

খানিকক্ষণ নীরবে চলবার পরে পাধ্যেই আবার কথা কইলেন, বললেন: না, এই পৃথিবীকেও সেই পৃথিবী মনে হচ্ছে না।

আমি আশ্চর্য হলাম ভদ্রলোকের কথা শুনে। নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক অন্যমনস্ক ভাবে বললেন: পৃথিবীটা বড় বেশি বদলে গেছে। প্রতিদিন বদলাচ্ছে।

হয়তো তাই, হয়তো বা একটুও বদলায় নি। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনার আগ্রহ আমার ছিল না। তাই চুপ করে ছিলাম।

কিন্তু খানিকক্ষণ নীরবে চলবার পর পাধ্যে বললেন: কিন্তু কেন এমন হল বলতে পার?

আমি সংক্ষেপে বললাম: না।

পাধ্যে বললেন: নিশ্চয়ই এর একটা কারণ আছে। আমার মনে হয় যে সংযমের অভাবেই পৃথিবীটা এমন তাড়াতাড়ি বদলে গেল।

ঋতুর হিসাবে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা এসেছে, কিন্তু বৃষ্টিপাত নেই। প্রত্যুষের বাতাসে আছে হিমের আমেজ। কলস্বনা গঙ্গার তীরে

তীরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পাধ্যে বললেন: আমরা এগোচ্ছি না, আমরা পিছিয়ে আসছি।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

পাধ্যে বললেন: ঠিকই বলছি আমি। সভ্যতা আমাদের এগোচ্ছে না, যুগে যুগে আমরা পিছিয়ে আসছি। আমাদের শাস্ত্রের কথাই ঠিক।

কী রকম?

আমাদের মুনি ঋষিরা বলতেন যে সভ্যতার ক্রমোন্নতি হয় না, সভ্যতার বিনাশ হয় কালক্রমে। এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছি। সত্য যুগের কথা ভেবে দেখো। সেকালের সমাজ কি সর্ব বিষয়ে উন্নততর ছিল না!

আমি বললাম: মানুষের মনুষ্যত্ব যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের এমন উন্নতি বোধহয় ছিল না।

অপ্রসন্ন ভাবে পাধ্যে বললেন: এ তোমার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফল। বিদেশের পণ্ডিতরা আমাদের সভ্যতাকে মানতেন না, আজও আমাদের সম্বন্ধে একটা হীন ভাব তাঁরা পোষণ করেন। শুধু বিদেশের লোক কেন, আমাদের দেশেও এমন লোক আছে যারা আমাদের বর্বর জাত বলে মনে করে। আমি উচ্চ-শিক্ষিত ধনী সমাজে দেখেছি যে তাঁদের বৈঠকখানায় নানা দেশের পত্র-পত্রিকা ছড়ানো আছে, কিন্তু মাতৃভাষার কোন কাগজ নেই। যে কাগজে ভারতবাসীকে বর্বর বলে গালাগালি দেয়, সে কাগজটি তারা উনুনের আগুনে গুঁজে দেয় না। তাকে যত্ন করে রাখে, দেখায় বন্ধুবান্ধবকে।

পাধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি তাঁকে শান্ত করবার জন্য বললাম: আপনি সত্য যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির কথা বলুন।

পাধ্যে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পথ চললেন। তারপরে বললেন: বিংশ শতাব্দীর সব চেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার হল গ্রহান্তরে অভিযান। সত্য যুগে এ কাজটি যে অত্যন্ত সহজ ছিল তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিভিন্ন জাতি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাতায়াত করতেন

অত্যন্ত অবলীলাক্রমে। গন্ধর্বলোক গুহ্যকলোক বিদ্যাধরলোক এ সব পৃথিবীতেই ছিল, না গ্রহান্তরে, তা ভেবে দেখবার ও গবেষণা করবার সময় এসেছে। মহাভারতে আমরা দেখি যে ইন্দ্রলোক থেকে রথ এল অর্জুনের কাছে, তারপর সেই রথ আকাশে উঠল অর্জুনকে নিয়ে। এই অভিযানের বর্ণনা পড়লে মনে হয় না যে বর্তমান যুগের বিমান এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাচ্ছে, মনে হয় যে সে গ্রহান্তরে যাত্রা। মহাভারতের লেখক বেদব্যাস তো এ কালের বিমান দেখেন নি, স্পুটনিক রকেট বা স্পেস ক্র্যাফটও দেখেন নি তিনি। তবে তিনি কী দেখে এই সব বর্ণনা লিখলেন! বিদেশের কোনও প্রাচীন কবি কি পুরাকালে এমন কিছু বর্ণনা করতে পেরেছেন যা আমরা আজও চোখে দেখি নি! কল্পনার পাখা আছে সত্য, কিন্তু সে কল্পনা অশ্রুতপূর্ব জিনিসকে নিয়ে নয়। স্বপ্নেও আমরা বাস্তবেরই রূপ দেখি।

পাধ্যের মন্তব্য আমার কাছে অকাট্য বলে মনে হল। আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

চলতে চলতেই পাধ্যে বললেন: আজ কেন তোমাকে এই কথা বলছি জানো?

জানি না।

বলছি এই জন্যে যে এখন যে প্রসঙ্গ আমরা গুরুজীর কাছে শুনছি তা শুধু গল্প বলে মনে করলে চলবে না। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে তাকে বিচার করে দেখতে হবে। এর ভেতর একটা মস্ত বড় সত্য আছেই। শুধু আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস নয়, বিজ্ঞানের উন্নতির কথাও আছে। তাকে আবিষ্কার করার কোন চেষ্টা আজও হয় নি। কাউকে তো সে চেষ্টা করতে হবে। কাউকে তো উৎসাহী করতে হবে সেই চেষ্টায়!

পাধ্যে এর পরে থামলেন। পথের উপরে দাঁড়িয়ে বললেন: চল এবারে ফেরা যাক।

আমরা আশ্রমের দিকে ফিরলাম। গাছের মাথায় তখন আমরা সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছি।

দুপুর বেলায় নিজের ঘরে বসে লেখার সময় আমি বারেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। নানা রকমের প্রশ্ন আমার মনটাকে অস্থির করে তুলছিল। উপদেবতাদের অনেকের কথা আমাদের শোনা হল। কিন্তু এই সব জাতিকে উপদেবতা বলার মতো কোন যুক্তি খুজে পাচ্ছিলুম না। কোনও বিশেষ গুণের কথা জানা গেল না, কোনও বিশেষ কর্মের কথাও না। কেন তারা দেবযোনি বলে স্বীকৃত, সেই পরিচয়ই অজ্ঞাত রয়ে গেল।

চাদর মুড়ি দিয়ে চেন্নুলু ঘুমোবার চেষ্টা করছিল। বলল ঃ অমন উসখুস করছ কেন?

বললাম ঃ স্বভাবের দোষে।

চেন্নুলু বলল ঃ মন স্থির করতে কিছু দিন সময় লাগবে। বইখাতা গুটিয়ে এখন শুয়ে পড়।

কোন অভদ্র ইঙ্গিত! মিসেস খুরানাকে নিয়েই যে এই মন্তব্য তাতে সন্দেহ নেই। বললাম ঃ ভুল করছ। যা ভাবছি তা তোমার ভাবনার মতো গোপন কিছু নয়। তুমি ঘুমোতে পার।

চেন্নুলু আর কোন কথা বলল না।

আমার মন আবার পুরনো ভাবনায় থমথমে হল।

গুহ্যক কথাটি আমি এখানে নতুন শুনলাম। কিন্তু এই জাতির সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার হল না। গুরুজী যতটুকু বললেন, তাতে কৌতূহলী মন পরিতৃপ্ত হয় নি। অথচ হাতের কাছে এমন কিছু নেই যা পড়ে একটা ধারণা মনঃপূত হয়। গুরুজীকে কোন প্রশ্ন করার সাহস আমার হয় নি। মনে হয়েছিল যে যা বলেছেন তার বেশি জানতে চাইলে তিনি বিরক্ত হবেন। মানুষের জানার তো একটা সীমা আছে, কৌতূহলেরও আছে একটা সীমা। এই দুটিকেই শ্রদ্ধা করা উচিত বলে আমি কোন প্রশ্ন করার বাসনা পরিত্যাগ করেছিলাম।

রামায়ণ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ অবিলম্বে পড়ে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু এ তো সহজ কাজ নয়। এর জন্য সময়ের

প্রয়োজন যত, তার চেয়ে ধৈর্যের প্রয়োজন বোধহয় বেশি। আজও আমি এমন মানুষের সন্ধান পাই নি যিনি এই সব অমূল্য গ্রন্থের সবগুলি পড়েছেন। দেশের বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাও পড়েছেন কিনা আমাব সন্দেহ আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দুশাস্ত্রের কথা পডানো হয় না, হিন্দুধর্মের কথাও বলা হয় না। অথচ ইংরেজ আমলে আমাদেব বাইবেল পডতে হত। নিজেদের ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে খ্রীষ্টধর্মের কথা আমরা বেশি জানি। এ তো দুর্ভাগ্যেরই কথা।

ভারত এখন সর্ব ধর্মের দেশ। সকল ধর্মের সমন্বয় কি সম্ভব! মাঝে থেকে এ দেশের লোকের ধর্মজ্ঞানই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। ধর্ম না থাকলে চবিত্র গঠন হয় না। চারিত্রশক্তির পিছনে আছে ধর্মজ্ঞান। ধর্ম বিজ্ঞান নয় যে যুক্তি দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, বিশ্বাসেব ভিত্তিতেই ধর্ম প্রবল শক্তির অধিকারী। ধর্মকে উপেক্ষা করেই আমরা দিনে দিনে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।



সন্ধ্যাবেলায় উপাসনার মন্দিরে আমরা সমবেত হলাম। নির্দিষ্ট সময়ে গুরুজী এলেন। বললেন ঃ গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা বলবার আগে নাগদের সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই উচিত হবে। নাগ দেবযোনি নয়, অথচ মানুষের সমাজেও তাদের দেখা যায় না। নাগ একটি স্বতন্ত্র জাতি। দেবেতর, কিন্তু মনুষ্যেতর নয়। অনন্ত নাগ দেবতার মতো পূজ্য। কাজেই উপদেবতার কথায় নাগের কথাও বলা উচিত।

ভরত অবশ্য বলেছেন যে তক্ষককর্কোটপ্রভৃতির্দেবযোনির্মনুষ্যাকারঃ ফণালাঙ্গুলযুক্তঃ। তক্ষক কর্কট প্রভৃতি নাগকে তিনি দেবযোনি বলেছেন। মনুষ্যাকার তারা, কিন্তু ফণা ও লাঙ্গুল বিশিষ্ট।

নাগের এই বর্ণনা শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম। নাগ বলতে আমরা সাপ বুঝি। সাপের ফণা ও লেজ দুই-ই আছে। কিন্তু তাদের মনুষ্যাকার বললে সত্যিই বিস্ময় জাগে। গুরুজী বোধহয় আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেনঃ আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তার কারণ নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসাকে বিবাহ করেছিলেন যাযাবর ঋষি জরৎকারু। তাঁদের পুত্র আস্তীক একজন মুনি ছিলেন। জনমেজয়ের সর্পসত্রে উপস্থিত হয়ে তিনি মাতৃকুলকে রক্ষা করেছিলেন।

সত্যি কথা। নরাকার না হলে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হত না। অথচ নরাকার প্রাণীর ফণা ও লেজ কল্পনা করতে কষ্ট হয়। গুরুজী বললেনঃ নাগজাতির এই বর্ণনা আছে পুরাণে, কিন্তু বর্ণানুরূপ কোন চিত্র আমরা কোথাও দেখি নি বলেই এই রূপটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না।

বলে থামলেন অল্পক্ষণের জন্য। তারপরে বললেনঃ তক্ষক নাগের গল্প মনে আছে?

তাউজীর দিকে তাকালেন গুরুজী। কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেনঃ বলুন। তারপর।

গুরুজী বললেনঃ গল্পটা পরে বলব, এই প্রসঙ্গে বলব তক্ষক নাগের রূপের কথা। রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করবার জন্য তক্ষক চলেছেন ব্রাহ্মণের বেশে।

ঠিক এই সময়ে তাউজী বাধা দিয়ে বললেনঃ রাজাকে দংশন করবেন কেন তা বলবেন না?

গুরুজী বললেনঃ সে কথা বলতে হলে আগে শমীক মুনির কথা বলতে হয়।

গল্প শোনার আগ্রহ আমাদের সকলের, তাই আমরা খুশী হয়ে

উঠলাম। গুরুজী তা লক্ষ্য করে বললেনঃ রাজা পরীক্ষিৎ বেরিয়েছিলেন মৃগয়ায়। শমীক মুনির আশ্রমের নিকটে একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করলেন, কিন্তু সেই মৃগ কোথায় পালিয়ে গেল দেখতে পেলেন না। খুঁজতে খুঁজতে শমীক মুনিকে দেখতে পেলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন মৃগের কথা। কিন্তু মুনি কোন উত্তর দিলেন না, তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। রাজা সে কথা জানতেন না। তাই একটি মৃত সর্প ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে মুনির গলায় জড়িয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।

শমীক মুনির এক ক্রোধী পুত্র ছিল। সে যখন শুনল যে রাজা এসে তার পিতার অপমান করে গেছেন তখন শাপ দিল রাজাকে। তার পিতার গলায় যে শাপ ঝুলিয়েছে সাত দিনের মধ্যে তক্ষক নাগ তাকে ছোবল দিয়ে দগ্ধ করবে। এ কথা শুনে শমীক বললেন, ছি ছি, এ তোমার অন্যায় হল। আমি যে মৌনব্রতধারী, রাজা তো সে কথা জানতেন না। তাই তাঁর কথার উত্তর দিই নি বলে রাগ করেছেন। পুত্র বলল, কিন্তু শাপ তো আমার মিথ্যা হবে না। উপায়ান্তর না দেখে শমীক মুনি এক শিষ্যকে দিয়ে রাজার কাছে এই খবর পাঠালেন।

রাজা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। একটি স্তম্ভের উপরে নির্মাণ করলেন একটি প্রাসাদ। আর বিষ-চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এমনি করে ছ দিন কেটে গেল, সাত দিনের দিন তক্ষক নাগ বেরলেন পরীক্ষিৎকে দংশন করতে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তিনি চলেছেন, পথে দেখা হল কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। তক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ছুটছেন কেন? ব্রাহ্মণ বললেন, তক্ষক নাগ আজ রাজাকে দংশন করবে, আমি তাঁকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।

এই পর্যন্ত বলে গুরুজী বললেনঃ একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়। সেটি হচ্ছে যে কাশ্যপ বিষ-চিকিৎসক হয়েও তক্ষককে নাগ বলে সন্দেহ করেন নি। তার মানে চেহারা দেখে নাগকে চেনা

যেত না, কিংবা নাগজাতি ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারত। ব্রাহ্মণের কথা শুনে তক্ষক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি এই গাছে দংশন করছি, আপনার মন্ত্রবলের পরীক্ষা হোক।

তক্ষকের দংশনে গাছটি জ্বলে গেল, কিন্তু ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলে সেই ভস্ম থেকে নূতন গাছের জন্ম হল। তক্ষক তখন ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণের শাপে রাজার আয়ুক্ষয় হয়েছে, আপনি ফিরে যান। রাজার চেয়ে আমি আপনাকে বেশি ধন দেব। এ কথায় রাজী হয়ে ব্রাহ্মণ ফিরে গেলেন।

তারপর তক্ষক কয়েকজন নাগকে পাঠালেন পরীক্ষিতের কাছে। এরা গেল তপস্বীর বেশে কুশ জল আর ফল নিয়ে। প্রহরীরা এদের চিনতে পারল না, চিনল না মন্ত্রীরা, রাজাও চিনলেন না। তপস্বীদের উপহার নিয়ে রাজা তাঁদের বিদায় দিলেন। তারপরে একটি ফলে দেখলেন ছোট একটি তামার রঙের কীট, সেই কীটই তক্ষক। নিজ মূর্তি ধরে রাজাকে বেষ্টন করে দংশন করলেন সগর্জনে। তারপরে আকাশে উড়লেন। তখন তাঁর পদ্মের মতো বর্ণ।

আমার এই গল্প শুনে ভারি আশ্চর্য বোধ হল। সন্দেহ রইল না যে নাগেরা ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করত। তা না হলে কীট রূপে তিনি আসতে পারতেন না। কিন্তু তার দরকার ছিল না। ব্রাহ্মণের রূপে এসেও তিনি রাজাকে দংশন করতে পারতেন।

গুরুজী বললেন ঃ তক্ষক আকাশ পথে উড়ে গেলেন। এই কথায় আর একটি সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। অন্যান্য দেবযোনির মতো নাগ জাতিরও অবাধ ভ্রমণের ক্ষমতা ছিল।

সত্যিই এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে যে আমরা গ্রহান্তরে যাবার কথা ভাবছি। কিন্তু আকাশে যথেচ্ছ বিচরণের কথা আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছু দিন আগে পুষ্পক রথ আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু এখন আর তা অবিশ্বাসের বস্তু নয়। এমন দিন কি আসবে না যেদিন আমরা আবার এই অবাধ বিচরণ প্রত্যক্ষ দেখতে পাব!

গুরুজী বললেনঃ এই নাগ জাতির জন্ম হয়েছিল দেবাসুর ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেন ঃ তক্ষকের গল্পটা শেষ করবেন না ?

গুরুজী হেসে বললেনঃ শমীক মুনির মতো রাজা পরীক্ষিৎও তাঁর মৃত্যুকে সহজ ভাবে নিয়েছিলেন। ফলের ভেতরে সেই কালো চোখের কীট দেখে হাসি মুখে বলেছিলেন, আমার আর দুঃখ বা ভয় নেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর নিয়তি এসেছে কীট হয়ে। ষাট বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। হাসিমুখে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

কিন্তু তাঁর শিশু পুত্র জনমেজয় বড় হয়ে যখন এই গল্প শুনলেন, তখন তক্ষককে আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্য সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করলেন। কালো কাপড় পরে ব্রাহ্মণরা বসলেন যজ্ঞ করতে। আর চারি দিক থেকে নানা জাতের ও নানা বর্ণের সর্প এসে যজ্ঞের আগুনে পড়তে লাগল।

গুরুজী বললেন ঃ এখানে এই নাগ জাতিকে নরাকার বলে মনে হচ্ছে না। রাজা হয়ে জনমেজয় মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারবেন মনে হয় না, আর ব্রাহ্মণেরা এই অমানুষিক কাজ করবেন বলেও বিশ্বাস হয় না। নাগ এখানে সাপ বলেই মনে হয়। তাই তার নানা জাতি ও নানা বর্ণ বলা হয়েছে। এরা নামহীন নাগ। তক্ষক ও বাসুকি তখন সর্পসত্রে কুলক্ষয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।

তক্ষক নাগ আশ্রয়ের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন। ইন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক। কিন্তু বাসুকি কাতর হয়ে তাঁর ভগিনী মনসাকে বললেন প্রতিকার করতে। বললেন, তোমার পুত্র আস্তীক ছাড়া আর কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

তাউজী বললেন ঃ কেন ?

গুরুজী বললেন ঃ তাহলে এবারে কদ্রু বিনতার গল্প বলতে হয়, কদ্রুর শাপের গল্প। মা হয়ে পুত্রদের তিনি শাপ দিয়েছিলেন, তারা

আগুনে পুড়ে মরবে।

তাউজী বললেন ঃ গল্পটি তাহলে বলুন।

গুরুজী বললেন ঃ অন্য কোন প্রসঙ্গে বোধহয় এ গল্প বলেছি।

কিন্তু তাউজী মানলেন না, বললেন ঃ তা হোক, আমরা আবার শুনব।

গুরুজী প্রসন্ন মুখে বললেন ঃ কশ্যপ মুনির অনেকগুলি পত্নীর কথা বলেছি। কশ্যপ একজন প্রজাপতি ঋষি। তিনি দক্ষ প্রজাপতির সতেরটি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, আর দেবতা দৈত্য প্রভৃতি সতেরটি কুলের তিনি জনক। এর মধ্যে কদ্রুর সন্তান হল নাগ, কিন্তু সর্প ক্রোধবশার সন্তান।

এ কথা শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম। নাগ ও সর্পে কি তাহলে প্রভেদ আছে। তাউজী গুরুজীকে এই প্রশ্ন করতেই গুরুজী বললেন ঃ পুরাণেই মতান্তর আছে। কোন পুরাণে কশ্যপের সাতটি স্ত্রী, কোন পুরাণে তেরটি। যে পুরাণে সাতটি স্ত্রী, তাতে কদ্রু সর্পকুলের জননী। ক্রোধা ও খসা নামের স্ত্রী আছেন, আবার ক্রোধবশাও আছেন। পুরাণান্তরে ক্রোধবশা দশটি মৃগীর জননী, সাধারণ ভাবে কদ্রু হলেন নাগমাতা. সপত্নী বিনতার সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে। বিনতা সূর্যের সারথি অরুণ ও বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের জননী।

একদিন কদ্রু ও বিনতা এক সঙ্গে বসে আছেন। এমন সময় ইন্দ্রের অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবাকে তাঁরা দেখতে পেলেন। কদ্রুর দুর্বুদ্ধি হল বিনতাকে দাসী করবার, তাই উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ নিয়ে বিনতার সঙ্গে তর্ক করলেন। কদ্রু বললেন, এর পুচ্ছের লোম কালো ; আর বিনতা বললেন, সাদা। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে পর দিন তাঁরা ভাল করে দেখবেন এবং যার কথা ভুল হবে তাকে অন্যের দাসী হতে হবে।

উচ্চৈঃশ্রবার সাদা লেজ। তবু বিনতা হেরে গিয়ে কদ্রুর দাসী হলেন। কদ্রু তাঁর নাগপুত্রদের বলেছিলেন যে ঐ অশ্বের পুচ্ছ লগ্ন

হয়ে সাদাকে কালো করতে হবে। যারা এই অধর্মের কাজে রাজী হল না, তাদের তিনি শাপ দিলেন যে জনমেজয়ের সর্পসত্রে তারা দগ্ধ হবে। অন্য নাগেরা মাতার আদেশ পালন করে বিমাতাকে পরাস্ত করল।

গুরুজী বললেন ঃ এখানে এই নাগদের সর্প বলেই মনে হচ্ছে। মানুষ পুচ্ছলগ্ন হতে পারে না, পারে সাপ। পরের ঘটনাতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। মায়ের মুক্তির জন্য গরুড় বলেছিলেন, কী পেলে তোমরা আমার মাকে মুক্তি দেবে? সর্পরা বলেছিল, অমৃত পেলে। গরুড় নিজের বাহুবলে স্বর্গ থেকে সেই অমৃত হরণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হল, কিন্তু অমৃত উদ্ধার করতে পারলেন না ইন্দ্র। গরুড় বললেন, আমার মায়ের মুক্তির পরে তোমরা এই অমৃত হরণ কোরো। খুশী হয়ে ইন্দ্র বললেন, তুমি বর নাও। সর্পেরা তাঁর ভক্ষ্য হবে, এই বর নিলেন গরুড়।

গুরুজী বললেন ঃ সেই একই যুক্তি। মানুষ হলে গরুড় তাদের ভক্ষণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না।

তাউজী বললেন ঃ আমার তা মনে হয় না। গরুড় নিস্পদদের ভক্ষণ করেছিল, গজকচ্ছপকেও। কাজেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাঁর ছিল, এ কথা আমরা মানতে পারি না। আর সর্প যে সুখাদ্য তাও নয়। বরং আমার মনে হয় যে সর্পদের উপর তিনি রেগে ছিলেন বলেই এই বর চেয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছে।

গুরুজী মেনে নিলেন এই কথা। বললেন ঃ তাও হতে পারে। তারপরে সর্পদের জিহ্বা কী করে দ্বিধা বিভক্ত হল সেই গল্প। অমৃত ভাণ্ড এনে গরুড় কুশের উপর রেখেছিলেন, বলেছিলেন, তোমরা স্নান করে এসে খেয়ো। কিন্তু অমৃত তাদের ভাগ্যে জোটে নি। তারা যখন স্নান করতে গিয়েছিল, ইন্দ্র সেই সময়ে অমৃত হরণ করেছিলেন। নাগরা ফিরে এসে অমৃত না পেয়ে কুশ চেটেছিল, আর তারই ফলে তাদের জিভ হয়েছিল দ্বিধা বিভক্ত।

কদ্রুর পুত্রদের মধ্যে অনন্ত বা বাসুকি হলেন জ্যেষ্ঠ। তারপর

কম্বল কর্কোটক পদ্ম মহাপদ্ম শঙ্খ ফুলিক অপরাজিত প্রভৃতি কয়েকজন পরাক্রান্ত নাগের নাম পাওয়া যায়। এদের ভগিনী হলেন জরৎকারু। তাঁর অন্য নাম মনসা। কশ্যপের মানস কন্যা বলে নাকি মনসা নাম হয়েছে। ব্রহ্মার উপদেশে সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে তাঁর জন্ম। কুমারী অবস্থায় তিনি মহাদেবের কাছ থেকে মন্ত্র ও পূজা শিখে সিদ্ধ হন।

মায়ের শাপের ভয়ে নাগরাজ বাসুকি যখন আত্মরক্ষার জন্য তপস্যা শুরু করেছেন, তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে বলল যে তাদের এক ভাগনে সবাইকে রক্ষা করবে। কদ্রু যখন শাপ দিয়েছিলেন তখন সে তাঁর কোলে বসে ব্রহ্মার কথা শুনেছে। ব্রহ্মা বলেছেন যে তাদের বোন জরৎকারুর বিবাহ হবে জরৎকারু মুনির সঙ্গে, আর তাদের পুত্র আস্তীক সবাইকে বাঁচাবে।

এই কথা শুনে বাসুকি জরৎকারু মুনির খোঁজে বেরলেন। কিন্তু মহাতপস্বী পরিব্রাজক ঋষি আজন্ম ব্রহ্মচারী, বিবাহ তিনি করবেন না। হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁকে মত পরিবর্তন করতে হল। একদিন তিনি কয়েকজনকে একটা গাছ থেকে অধোমুখে ঝুলতে দেখে তার কারণ জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন যে জরৎকারু নামে তাঁদের এক বংশধর বিবাহ করে নি, বংশ লোপের আশঙ্কায় তাঁরা ঐ ভাবে আছেন। জরৎকারু নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে সম নামের কোন কন্যাকে ভিক্ষা পেলে তিনি বিবাহ করে বংশরক্ষা করবেন। বাসুকি আর কাল বিলম্ব করলেন না, জরৎকারু মুনির হাতেই ভগিনীকে সম্প্রদান করলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে এসেছিল। মনসা যদি কশ্যপের মানস কন্যা হন, তাহলে তিনি নাগকন্যা নাও হতে পারেন। কদ্রুর কন্যা হলেই তাঁকে নাগকন্যা বলা সঙ্গত। কিন্তু এই গল্প থেকে জানা যাচ্ছে যে মনসা বাসুকির ভগিনী এবং ভগিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন বাসুকি। কশ্যপের মানস কন্যা বলে মনসা ইন্দ্রাদি দেবতা দৈত্য দানব প্রভৃতি সকলেরই ভগিনী। বাসুকির উপরে

তাহলে ভগিনীর বিবাহের ভার পড়ত না। গুরুজীকে এ কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না, তাই তিনি বলতে লাগলেন ঃ জরৎকারুর পুত্র আস্তীক তাঁর মাতুলালয়ে নাগদের নিকটে মানুষ হয়েছিলেন। তার কারণ তাঁর জন্মের কিছু পূর্বেই জরৎকারু তাঁর মাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সে অন্য গল্প, সে গল্প বোধহয় অন্য প্রসঙ্গে বলেছি।

তাউজী মাথা নেড়ে বললেন ঃ বলেছেন।

গুরুজী বললেন ঃ জনমেজয়ের সর্পসত্রের সময় বাসুকির অনুরোধে মনসা তাঁর পুত্র আস্তীককে পাঠালেন নাগকুল রক্ষার জন্য।

সর্পযজ্ঞে তখন অনেক সাপ মারা পড়েছে, কিন্তু প্রধান শত্রু তক্ষক তখনও আসে নি। তক্ষক ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। যজ্ঞের হোতারা তখন ইন্দ্রকে আহ্বান করলেন। ইন্দ্র তক্ষককে নিজের উত্তরীয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন জেনে জনমেজয় ইন্দ্রকেই আগুনে নিক্ষেপ করতে বললেন। ইন্দ্র তখন আশ্রিত তক্ষককে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

এ দিকে আস্তীক মুনি যজ্ঞ স্থলে ঢুকতে পারেন নি। যজ্ঞ স্থলের পরিমাণ মাপবার সময় একজন পুরাণ কথক বলেছিলেন যে কোনও ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন। তাই রাজার আদেশে দ্বারপালরা সবাইকে বাধা দিচ্ছিল। আস্তীক জনমেজয়ের স্তুতি করে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন এবং রাজা এই মুনিকে বর দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তক্ষক তখন মন্ত্র বলে যজ্ঞাগ্নির দিকে আসছে। ঋত্বিকরা রাজাকে বললেন, এবারে তক্ষক আসছে। এখন আপনি ব্রাহ্মণকে বর দিতে পারেন।

রাজা বললেন, বালক, তুমি বর চাও।

আস্তীক আকাশের দিকে চেয়ে তক্ষককে বললেন, তিষ্ঠ।

আর রাজাকে বললেন, এই যজ্ঞ এখনই বন্ধ হোক।

রাজা বিব্রত ভাবে বললেন, তুমি অন্য বর নাও।

আস্তীক উত্তর দিলেন, অন্য কিছু চাই নে, আমি শুধু আমার মাতৃকুলের মঙ্গল চাই।

সংকল্পবদ্ধ রাজা সেই বরই দিলেন।

যজ্ঞ নিবৃত্ত হল। রক্ষা পেল নাগকুল।

এখনও আমরা সাপ দেখলে বলি, আস্তীক আস্তীক। এই নামে আমাদের সাপের ভয় দূর হয়। আর রাত্রে শয়ন কালে প্রণাম করি আস্তীক জননীকে।

আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসা দেবী নমোঽস্তুতে ॥



গুরুজী বললেন : স্মৃতিশাস্ত্রের মতে বাসুকি হলেন অষ্টনাগের মধ্যে দ্বিতীয় নাগ।

তারপর তাউজীর দিকে তাকিয়ে সংস্কৃত শ্লোকটি শোনালেন।—

অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোঽষ্টনাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

তাউজী খুব তৎপর ভাবে এই শ্লোকটি লিখে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু না পেরে গুরুজীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন : আর একবার বলবেন ?

গুরুজী বললেন : পরে লিখে নিও।

দণ্ডপানি সাধারণত চুপ করে থাকেন, কিন্তু এইবারে বললেন : যিনি অনন্ত, তিনিই তো বাসুকি !

গুরুজী বললেন : তিনিই শেষ। আমাদের পুরাণকাররা বাসুকিকেই

অনন্ত নাগ ও শেষ নাগ বলেছেন। শুধু স্মৃতিশাস্ত্রের মতে আমরা মনসা পূজার দিন যে অষ্ট নাগের পূজা করি, তাতে অনন্ত প্রথম ও বাসুকি দ্বিতীয়। ভবিষ্য পুরাণে যে ধ্যান আছে, তাতে আমরা তাঁর রূপের বর্ণনা পাই।—

ফণাসহস্রসংযুক্তং চতুর্বাহুং কিরীটিনং।
নবাম্রপল্লবাকারং পিঙ্গল শ্মশ্রুলোচনম্॥
পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরং।
করাগ্রে দক্ষিণে পদ্মং গদাং তথ্যাপ্যধঃ করে॥
দধানং সর্বলোকেশং সর্বাভরণভূষিতম্।
ক্ষীরাব্ধিমধ্যে শ্রীমন্তমনন্তং পূজয়েত্ততঃ॥

তিনি থামতেই তাউজী বললেনঃ এ বিষ্ণুর ধ্যান, না বাসুকির?

গুরুজী সহাস্যে বললেনঃ চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দেখে বিষ্ণু বলেই মনে হয়। কিন্তু সহস্র ফণাও আছে, আবার ক্ষীর সমুদ্রে অনন্ত নামও আছে। কালিকা পুরাণের বর্ণনা মনে আছে তো?

মাথা নাড়লেন তাউজী। বললেনঃ না।

গুরুজী বললেনঃ প্রলয়ের সময় বিষ্ণু লক্ষ্মীকে নিয়ে অনন্তের মধ্যম ফণায় শয়ন করেন। অনন্ত তাঁর পূর্ব ফণা পদ্মের মতো বিস্তৃত করে বিষ্ণুকে আচ্ছাদন করেন, পশ্চিম ফণা তালবৃন্তের মতো করে ব্যজন করেন তাঁকে। দক্ষিণ ফণায় উপাধান ও উত্তর ফণায় পাদপীঠ রচনা করেন। বিষ্ণুর এই অনন্ত শয়ন মূর্তির সঙ্গে আমরা সবাই খুব পরিচিত।

তাউজী বললেনঃ কিন্তু অনন্তের তো এখানে চতুর্ভুজ মূর্তি নয়, এখানে আমরা তাঁর নাগরূপ দেখি।

গুরুজী বললেনঃ শুধু এখানে কেন, প্রায় সর্বত্রই আমরা তাঁর নাগরূপ দেখি। কিন্তু বাসুকি নাগ তক্ষকের মতো কাউকে দংশন করেন নি। তাঁর মতো ধার্মিক আমাদের শাস্ত্র পুরাণে কম আছে। বোধহয় তোমাদের মনে আছে যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মতো ঋষিও সুবিচারের জন্যে পাতালে বাসুকির কাছে গিয়েছিলেন।

তারপরেই প্রশ্ন করলেনঃ পাতাল সম্বন্ধে তোমাদের কোন ধারণা আছে?

ধারণা আমাদের কারও ছিল না, কিন্তু কেউই আমরা উত্তর দিলাম না।

গুরুজী বললেনঃ পাতালের বিস্তৃত বিবরণ প্রায় সব পুরাণেই আছে। পাতাল একটি দুটি নয়, পাতাল সাতটি। তাদের নাম অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল। স্বর্গের চেয়ে বেশি সুখকর এই সব স্থান। এই জন্যেই মুনিরা পাতালকে বিল স্বর্গ বলতেন। যেমন স্বর্গে তেমনি পাতালেও আছে সুন্দর উদ্যান ও ভবন। পৃথিবীর অধোদেশে আছে এই সব পাতাল। সেখানে চন্দ্র সূর্যের আলো পৌঁছয়, কিন্তু চন্দ্রের শীত ও সূর্যের উত্তাপ পৌঁছয় না।

সপ্ত পাতালের নাম শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সকলেই বোধহয় আমার মতো আশ্চর্য হয়েছিলেন। তা বুঝতে পেরে গুরুজী বললেনঃ এই সব পাতালের অধিবাসীরা এক নয়। অতলে থাকেন ময় পুত্র মহামায়, ছিয়ানব্বুই রকমের মায়া তিনি বিস্তার করতে পারতেন। তার নিচে বিতল পাতাল, সেখানে আছেন ভবানী ও ভূতগণকে নিয়ে হাটকেশ্বর মহাদেব। সুতল পাতালে বাস করেন দৈত্যরাজ বলি। বিষ্ণু তাঁকে বন্ধন করে এই পাতালে পাঠিয়েছিলেন। তার নিচে তলাতল পাতালে আছেন ময়দানব নিজে। মহাতল পাতালে নাগদের বাস। গরুড়ের ভয়ে তারা এইখানে বাস করছে। কিন্তু নাগরাজ বাসুকি আরও নিচে আছেন সপ্তম পাতালে, মাঝখানে রসাতলে বাস করছেন ইন্দ্রভয়ে ভীত দানবেরা।

গুরুজী বললেনঃ বাসুকির কথায় পাতালের কথা এসেছে। কিন্তু বাসুকি এই পাতালে এলেন কেন, সে সম্বন্ধেও একটি গল্প আছে। কদ্রু যে কপট উপায়ে সপত্নী বিনতাকে দাসী করতে চেয়েছিলেন তাতে ধার্মিক নাগেরা অসম্মত হয়েছিলেন। বাসুকি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাই মা তাঁদের সাপ দিয়েছিলেন যে জনমেজয়ের সর্পসত্রে

তারা দগ্ধ হবে। মায়ের এই অভিশাপ মাথায় নিয়ে বাসুকি নানা তীর্থ পর্যটন করেন ও কঠোর তপস্যায় রত হন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন বর নাও। কিন্তু বাসুকি বলেছিলেন, কোন বর লাভের জন্য আমি তপস্যা করছি না। তপস্যায় আমি দেহত্যাগ করতে চাই, পরলোকেও আমি আমার মতিভ্রষ্ট ভাইদের সংসর্গ চাই না। এর পরেই ব্রহ্মা তাঁকে পাতালে নিয়ে গিয়ে এই চঞ্চলা পৃথিবী ধারণ করতে বললেন। সেই থেকে বাসুকি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন নিশ্চল ভাবে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললে পৃথিবী কেঁপে ওঠে, ভূমিকম্প হয় পৃথিবীতে। প্রতি কল্পের শেষে তাঁর মুখ থেকে যে আগুন বেরোয়, সেই আগুনেই সৃষ্টি ধ্বংস হয়। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে তখন তিনি নিজের ফণার উপরে শয়ন করান। অসীম বলশালী বাসুকির শক্তির পরিমাপ আজও হয় নি। তাই তাঁকে ভগবান সঙ্কর্ষণ নামে পূজা করা হয়।

বাসুকি নাগ হলেও গরুড়ের সঙ্গে তাঁর কোন বিবাদ নেই। ব্রহ্মার জন্য এই বন্ধুতা হয়েছে। ব্রহ্মার কথায় বাসুকি পাতালে গিয়ে পৃথিবী ধারণ করে আছেন বলে তিনি খুশী হয়েছিলেন, গরুড়কে বলেছিলেন বাসুকির সহায় হতে।

দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় এই বাসুকি এসে রজ্জু হয়েছিলেন। দেবাসুর মন্দর পর্বত এনেছিলেন মন্থনের দণ্ড করবার জন্য, কিন্তু অত বড় রজ্জু পাওয়া যাবে কোথায়। তাই বাসুকির দরকার হয়েছিল। কঠিন কাজ, প্রাণান্তকর। কিন্তু বাসুকি আপত্তি করেন নি। দধীচি যেমন নিজের অস্থি দিয়েছিলেন বজ্র নির্মাণের জন্য, তেমনি বাসুকি তাঁর বিরাট দেহ দিয়েছিলেন রজ্জু রূপে ব্যবহারের জন্য। দেবতারা তাঁর লেজের দিকে ধরেছিলেন, আর অসুরেরা ধরেছিলেন তাঁর ফণার দিকে। কষ্টে পরিশ্রমে ও যন্ত্রণায় তাঁর মুখ দিয়ে বিষ নির্গত হয়েছে, কিন্তু প্রাণ বহির্গত হয় নি। মন্দর পর্বত ও বাসুকির সহিষ্ণুতায় মন্থন কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু এর পুরস্কার স্বরূপ কী পেয়েছিলেন তাঁরা ?

সত্যিই তো, গুরুজীর মতো এমন করে আমরা কোন দিন ভাবি

নি। দেবতা ও অসুরদের পরিশ্রমের কথা আমরা ভেবেছি, ভাবি নি এই ছুজনের নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা।

গুরুজী বললেনঃ কিছুই পান নি। একটি একটি করে কত জিনিসই তো উঠেছিল সমুদ্র থেকে, বিষ্ণু দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছু ভাগ করে দিয়েছিলেন দেবাসুরের মধ্যে। যে হলাহল উঠেছিল তার জন্যে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করা হল, আর অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ছু দলের মধ্যে। বিষ্ণু মোহিনী মূর্তি ধরে তাদের ভুলিয়ে নিয়ে গেলেন। সমুদ্রে পড়ে রইল মন্দর পর্বত, আর বাসুকি ফিরে গেলেন পাতালে। আবার তাঁকে পৃথিবী ধারণ করে থাকতে হবে।

আশ্চর্য চরিত্র! কাজে নামবার আগে কোন মজুরি দাবী করেন নি, কাজ করে দেবার পরেও কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন নি। নিঃশব্দে নিজের কর্তব্য পালন করে স্বস্থানে ফিরে গিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি শোনা গল্প মনে পড়ল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে শ্রেষ্ঠতার বিচার চেয়েছিলেন। কে হবে বিচারক! শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে পাতালে আছেন বাসুকি, তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ বিচারক। দেবতা নয়, রাজা নয়, কোন তপস্বী মহাপুরুষও নয়, পাতালবাসী বাসুকি নাগ হলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রের শ্রেষ্ঠতার দ্বন্দ্বের উপযুক্ত বিচারক। ছুজনে এক মত হয়ে পাতালে গেলেন, বাসুকিকে জানালেন তাঁদের অভিপ্রায়। বাসুকি বললেন, আমার মাথার পৃথিবী একজন ধারণ কর, তারপর সুস্থ মাথায় এই বিচার করব।

বিশ্বামিত্র এগিয়ে গিয়ে ছু হাতে পৃথিবী ধারণ করলেন, কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না, অতলে তলিয়ে যেতে লাগলেন। বাসুকি বললেন, তোমার তপস্যার বল প্রয়োগ কর, তাহলে পৃথিবী স্থির হবে।

বিশ্বামিত্র বললেন, আমার সারা জীবনের তপস্যায় যদি কোন শক্তি অর্জন করে থাকি তো সেই শক্তি অর্পণ করলাম। পৃথিবী স্থির হও।

কিন্তু পৃথিবী স্থির হলেন না।

বাসুকি বললেন, আর তুমি কী দিতে পার ?

বিশ্বামিত্র ভাবতে লাগলেন, আর আমার দেবার কী আছে!

বাসুকি বললেন, কোন সাধু সঙ্গের পুণ্য ফল ?

সাধু সঙ্গ! কোন সাধু সঙ্গ কি আমি করেছি! বশিষ্ঠ যদি সাধু হয় তো তার সঙ্গে সারা জীবন শত্রুতাই করেছি!

বাসুকি বললেন, সেই ফলই অর্পণ কর।

বিশ্বামিত্র কাতর ভাবে বললেন, বশিষ্ঠের সঙ্গে আমার সঙ্গের সুফল অর্পণ করলাম। পৃথিবী স্থির হও।

অমনি স্থির হলেন পৃথিবী। বিশ্বামিত্র মাথা নিচু করে বললেন, আমি হেরে গেছি।

বশিষ্ঠ বললেন, না, আজ তুমি জিতলে। আজ তোমার ষষ্ঠ রিপু অহংকার দূর হয়েছে; আজ তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে আমরা স্বীকার করলাম।

বাসুকির বিচারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দীর্ঘ দিনের বিরোধ মিটে গেল। কর্মের দ্বারা ক্ষত্রিয়ও ব্রাহ্মণ হতে পারে, আবার কর্ম দোষেই ব্রাহ্মণ হতে পারে চণ্ডালে পরিণত।



বাসুকি নাগের পরিবারের কথা আমরা কিছুই জানি নে। তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা, তাঁর পুত্র কন্যা ছিল কিনা, তার উল্লেখ

কোনখানে দেখি নি। অষ্টনাগের সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম যে নাগের কথা বোধহয় শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেই শুনতে পেলাম যে গুরুজী বলছেন: কিন্তু তক্ষক নাগের পরিবারের কথা জানা যায়। মহাভারতে তাঁর স্ত্রীর কথা আছে, অর্জুন তাঁকে বধ করেছিলেন।

তাউজী চমকে উঠে বললেন: অর্জুন নারী হত্যা করেছিলেন?

গুরুজী বললেন: খাণ্ডবদাহের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুন খাণ্ডব বনের সমস্ত প্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করেছিলেন। শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে বারো বছর ঘি খেয়ে অগ্নির অরুচি রোগ হয়েছিল। ব্রহ্মা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে খাণ্ডব বন দগ্ধ করে সমস্ত প্রাণীর মেদ ভক্ষণ করলে এই রোগ সারবে। কোন প্রাণী যাতে পালিয়ে না যায় তার জন্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন দাঁড়িয়েছিলেন দু দিকে।

এই খাণ্ডব বনে তক্ষক নাগ সপরিবারে বাস করতেন। কিন্তু তিনি তখন সেখানে ছিলেন না, কোন কাজে গিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্রে। তক্ষকের স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেন ছিলেন বনে। অগ্নি এই বন দগ্ধ করছেন দেখে অশ্বসেন বেরবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন তক্ষকের স্ত্রী তাঁর পুত্রকে গিলে ফেলে আকাশ পথে বেরবার চেষ্টা করলেন। অর্জুনের বাণে তাঁর শিরশ্ছেদ হল।

এই তক্ষক নাগের সঙ্গে ছিল ইন্দ্রের সখ্যতা। ইন্দ্র তাই এই পরিবারকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। অশ্বসেনকে পালাবার সুযোগ দেবার জন্য তিনি বারি বর্ষণ করে অর্জুনকে সাময়িক ভাবে মোহগ্রস্ত করেছিলেন। সেই সুযোগে অশ্বসেন মুক্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। অর্জুনেরা তাঁকে সাপ দিলেন যে সে নিরাশ্রয় হবে।

অশ্বসেন এই ঘটনার কথা ভোলেন নি। মাতৃহত্যার বা অভিশাপের প্রতিশোধ নেবার জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এসেছিলেন কর্ণের কাছে। কর্ণ যখন অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, অশ্বসেন তখন

সর্পবাণ হয়ে কর্ণের তূণে প্রবেশ করলেন তাঁর অজ্ঞাতে। আর কর্ণও এই বাণ নিক্ষেপ করলেন। কৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন এই ব্যাপার। তাই অর্জুনকে রক্ষার জন্য নিজের পায়ের চাপে রথ নিচু করে দিয়েছিলেন। বাণ অর্জুনের বুকে লাগল না, লাগল তাঁর সোনার কিরীটে। সেটি দগ্ধ হয়ে গেল।

ব্যর্থ মনোরথ অশ্বসেন কর্ণের কাছে ফিরে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, বাণ রূপে আবার ব্যবহার করুন আমাকে। কর্ণ বললেন, না, তা হয় না। এক বাণ আমি দুবার ব্যবহার করি না। আর পরের সাহায্যে জয়লাভ করতেও চাই নে।

অশ্বসেন তখন নিজেই অর্জুনকে আক্রমণ করলেন। আর কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন তাঁকে বধ করলেন।

গুরুজী বললেন ঃ শুনে আশ্চর্য হবে যে এই অশ্বসেন ছিলেন অর্জুনের পুত্র ইরাবানের পিতৃব্য।

আমরা চমকে উঠলুম। অশ্বসেন কেমন করে অর্জুনের ভাই হতে পারেন! তাউজী বললেন ঃ আপনি বোধহয় মাতুল বলছেন!

সহাস্যে গুরুজী বললেন ঃ না। ইরাবান উলূপীর পুত্র, কিন্তু উলূপী অশ্বসেনের ভগিনী ছিলেন না। তাঁর ভ্রাতৃবধূ ছিলেন বলে মনে হয়। উলূপীর স্বামীকে ভক্ষণ করেছিলেন গরুড়।

অর্জুন কি তাহলে বিধবা নাগকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন!

গুরুজী বললেন ঃ মহাভারতে আমরা দেখি যে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের কালে অর্জুন এসেছিলেন গঙ্গা তীরে। তিনি যখন গঙ্গায় স্নানরত, তখন উলূপী এসে তাঁকে নাগলোকে টেনে নিয়ে যান। এই উলূপী কুমারী ছিলেন, না বিধবা, সে বিষয়ে মতান্তর আছে। কিন্তু সে আলোচনা করবার আগে এই রকমের আর একটি সম্বন্ধের কথা বলি। অর্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব ছিলেন বাসুকি নাগের দৌহিত্রের দৌহিত্র।

তাউজী তখনই বাধা দিলেন, বললেন ঃ একটু আগে যে আপনি বললেন, বাসুকি নাগ বিবাহিত ছিলেন কিনা তা জানা যায় না!

গুরুজী বললেন: সে কথাও ঠিক।

তবে?

মহাভারতে ভীমের নাগলোক দর্শনের কথা মনে আছে?

আর একবার বলুন আপনি।

গুরুজী বললেন: পাণ্ডু রাজার মৃত্যুর পরে বালক পঞ্চ পাণ্ডব যখন হস্তিনাপুরে বাস করছেন, তখন দুর্যোধনেরা সবাইকে খেলার জন্যে গঙ্গার তীরে নিয়ে গেলেন। ভীমকে হত্যা করার জন্য দুর্যোধন তাঁকে বিষ মিশ্রিত খাদ্য দিয়েছিলেন ও সবার অলক্ষ্যে সংজ্ঞাহীন ভীমকে বন্ধন করে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। ভীমও গঙ্গার জলে তলিয়ে নাগলোকে চলে যান ও নাগদের দংশনে সংজ্ঞা ফিরে পান। জঙ্গম সর্প বিষে স্থাবর কালকূট বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই সংবাদ পেয়ে বাসুকি এসেছিলেন ভীমকে দেখবার জন্য এবং দেখেই তাকে চিনতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, এ আমাদের দৌহিত্রের দৌহিত্র, ধনরত্ন দিয়ে একে খুশী কর।

কিন্তু আসলে ভীম তাঁর নিজের দৌহিত্রের দৌহিত্র ছিলেন না। কুন্তীর পিতার মাতামহ হলেন আর্যক নামে এক নাগরাজ। তিনিও বাসুকির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

তাউজী বললেন: তবে কি—

গুরুজী বললেন: আমার ঠিক মনে পড়ছে না, কুন্তীভোজ বা যাদবরাজা শূর, কে ছিলেন আর্যকের দৌহিত্র। শূরের পুত্র বসুদেব কৃষ্ণের পিতা, আর কন্যা পৃথা অপুত্রক রাজা কুন্তীভোজের কাছে পালিতা বলে কুন্তী নামে পরিচিত হয়েছিলেন। একটুখানি চেষ্টা করলেই জানা যাবে নাগকুলের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধের কথা।

গুরুজী বললেন: এখানে আজ একটি কথা বলা দরকার। নাগদের কাছে রসায়ন নামে এক অদ্ভুত পানীয় ছিল, তা পান করে অযুত হস্তীর বল সঞ্চয় হত। বাসুকি ভীমের উপরে প্রসন্ন দেখে আর্যক বলেছিলেন, একে ধনরত্ন দিয়ে কী হবে, যদি অনুমতি করেন তো একে রসায়ন পান করতে দেওয়া যায়। বাসুকি রাজী হয়েছিলেন,

আর বালক ভীম একটি একটি করে আটটি কুণ্ডের রসায়ন পান করে অযুত হস্তীর বল সঞ্চয় করেছিলেন। তারপরে ফিরেছিলেন নাগলোক থেকে।

গুরুজী এবারে উলূপীর কথায় ফিরে গেলেন। বললেন: উলূপী ছিলেন ঐরাবত বংশীয় কৌরব্য নাগের কন্যা।

তাউজী বললেন: ঐরাবত তো ইন্দ্রের হাতি!

গুরুজী বললেন: আমিও তাই জানি। কিন্তু হস্তীর বংশে নাগের জন্ম হল কেমন করে তা বলতে পারব না। তার চেয়ে ঐরাবতকে একজন নাগ বলে মনে করলে নতুন কোন সমস্যার উদ্ভব হয় না। মহাভারতেও এ কথার সমর্থন আছে। উলূপীকে নাগরাজ ঐরাবতের দুহিতা বলা হয়েছে। এইখানেই আমরা পেয়েছি যে উলূপী বিধবা ছিলেন, তাঁর স্বামীকে গরুড় ভক্ষণ করেছিলেন।

উলূপী যে আপনার কামনা চরিতার্থের জন্য অর্জুনকে নাগলোকে টেনে এনেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নিজের মনের কথা অপকটে জানিয়েছিলেন অর্জুনকে। কিন্তু অর্জুন তাঁকে গ্রহণ করতে চান নি, বলেছিলেন যে বারো বৎসর তাঁকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

কিন্তু উলূপী তাঁকে শাস্ত্রের বিধান শুনিয়েছিলেন। অর্জুনের ব্রহ্মচর্য শুধু দ্রৌপদীর জন্য। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দ্রৌপদী এক বৎসর করে একজন ভাইএর কাছে থাকবেন, আর অন্য ভাই তখন তাঁর মুখদর্শন করতে পারবেন না। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারেন নি বলেই অর্জুনের বনবাস। এই বনবাসের সময় অন্য নারীর সহচর্যে তাঁর সংকল্প ভঙ্গ হবে না।

এর পরই অর্জুন উলূপীকে বিবাহ করেছিলেন। ইরাবান নামে তাঁদের এক পুত্র হয়েছিল। অর্জুনকে উলূপী বর দিয়েছিলেন যে জলে তিনি অজেয় হবেন ও সমস্ত জলচর জীব তাঁর বশ হবে।

গুরুজী বললেন: মহাভারতের কাহিনী কিছু অন্য রকম। বিধবা উলূপী ছিলেন অনপত্যা। তাই ঐরাবত তাঁর কন্যাকে অর্জুনের নিকট অর্পণ করেছিলেন। আর অর্জুন তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন কর্তব্য-

বোধে। এই ক্ষেত্রজ পুত্রের নাম ইরাবান। অশ্বসেন নাগ ইরাবানের পিতৃব্য। অর্জুনের প্রতি তার অসীম বিদ্বেষের জন্য ইরাবানকে সে ত্যাগ করেছিল। ইরাবান তাই মানুষ হয়েছিল মায়ের কাছে।

অর্জুন যখন ইন্দ্রলোকে অস্ত্র শিক্ষা করছিলেন, তখন ইরাবান গিয়েছিল তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিতে। অর্জুন বলেছিলেন, যুদ্ধ বাধলে তোমাকে ডাকব, তুমি এস আমাদের সাহায্য করতে।

পিতার আজ্ঞায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে এসেছিল ইরাবান। গান্ধাররাজ শকুনির ছয় পুত্রের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়েছিল। ইরাবানের হাতে তারা নিহত হয়। দুর্যোধন তখন অলম্বুষ নামে রাক্ষসকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, মায়াবী নাগের সঙ্গে তুমি মায়া-যুদ্ধ কর। ইরাবান তার নাগসেনা নিয়ে অনন্ত নাগের মতো বিশাল মূর্তি ধারণ করে অলম্বুষকে আক্রমণ করলে অলম্বুষ গরুড়ের রূপ ধারণ করে নাগদের ভক্ষণ করে এবং ইরাবানকে মোহগ্রস্ত করে তাকে বধ করে খড়্গাঘাতে।

অর্জুনের পুত্র ইরাবানের মৃত্যু দেখে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ এগিয়ে এসেছিল সামনে। সেদিন তার ভয়ংকর যুদ্ধ দেখে কৌরবসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমার বভ্রুবাহনের কথা মনে পড়ল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় সে কি আসে নি? ঘটোৎকচ ইরাবান অভিমন্যু এরা যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধে। অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণ ছিল তারা। বভ্রুবাহনও তাদের সমবয়সী। অর্জুন তাঁর বনবাস কালে নাগলোক থেকে মণিপুরে এসেছিলেন। ইরাবানের পর জন্ম হয়েছিল বভ্রু-বাহনের। অভিমন্যু সকলের ছোট, তার জন্ম আরও পরে হয়েছে। কিন্তু সেও প্রাণ দিয়েছে বীরের মতো।

গুরুজী বললেনঃ উলূপীর কাহিনী এখানে শেষ হয় নি। মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বে আবার উলূপীর আবির্ভাব হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞের অশ্ব নানা দেশ ঘুরে মণিপুরে এল। বভ্রুবাহন তখন মণিপুরের রাজা,

ব্রাহ্মণদের নিয়ে সে এল অর্জুনকে অভ্যর্থনা করতে। অর্জুন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ তোমার কী রকম আচরণ! ক্ষত্রিয় হয়ে তুমি যুদ্ধ করছ না!

এই সময়ে উলূপী এলেন পাতাল থেকে পৃথিবী ভেদ করে। বভ্রুবাহনকে বললেন, আমি তোমার বিমাতা উলূপী। আমি তোমাকে বলছি যে যুদ্ধ করেই তুমি তোমার বীর পিতার প্রিয়পাত্র হবে।

বভ্রুবাহন আর দেরি করে নি, আক্রমণ করেছিল অর্জুনকে। তুমুল যুদ্ধের পর শরাঘাতে অর্জুনকে হতচেতন করেছিল। সংবাদ পেয়ে চিত্রাঙ্গদা এলেন রণস্থলে, কপালে করাঘাত করে বললেন, এ তোমার কেমন আচরণ উলূপী! পুত্রকে দিয়ে পিতাকে হত্যা করালে! কী অপরাধ করেছিল অর্জুন! অনেকগুলি বিবাহ করেছে। পুরুষের পক্ষে তা এমন দোষের কী!

ধীর স্থির উলূপীর চোখে শোকের কোন ছায়া ছিল না। চিত্রাঙ্গদা তাই বললেন, তোমার কি একটুও অনুতাপ হচ্ছে না! শোক নেই পতির জন্যে!

উলূপী কোন উত্তর না দিয়ে সঞ্জীবন মণিকে স্মরণ করলেন। মুহূর্তে সেই মণি নাগলোক থেকে উলূপীর কাছে চলে এল। বভ্রুবাহনও যুদ্ধে মৃতপ্রায় হয়েছিল, তারপর সংজ্ঞা লাভ করে শোকে মুহ্যমান হয়েছিল। উলূপী তাকে ডেকে বললেন, এই মণি তুমি তোমার পিতার বুকে রাখ। এই দিব্য মণির স্পর্শে মৃত নাগেরা জীবিত হয়, তোমার পিতাও বেঁচে উঠবেন।

সেই মণির ছোঁয়ায় অর্জুন বেঁচে উঠলেন। আশ্চর্য হলেন উলূপীকে দেখে। উলূপী বললেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শিখণ্ডীর সাহায্যে ভীষ্মকে নিপাতিত করে তুমি মহাপাপ করেছিলে, তার প্রায়শ্চিত্ত না হলে তোমার নরক ভোগ ছিল। পুত্রের কাছে তোমার পরাজয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল। এখন তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।

গুরুজী বললেনঃ এই কাহিনীতে একটা কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেটা নাগ জাতির ধর্মজ্ঞান। অর্জুন যে অন্যায় যুদ্ধে

ভীষ্মকে পরাজিত করেছেন এবং তার জন্য যে তাঁর নরক ভোগ অনিবার্য, এ কথা উলূপী যেমন বুঝেছেন, তেমন আর কেউ বোঝেন নি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা যুধিষ্ঠির বলেন নি, কৃষ্ণ বলেন নি, অর্জুনেরও মনে হয় নি। অথচ নাগকন্যা উলূপী পাতাল থেকে উঠে এসেছেন শুধু এই কথা বলবার জন্যে নয়, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে। উলূপী বলেছেন যে এই পাপ শান্তির বিধান দিয়েছেন ভাগীরথী ও বসুগণ। তিনি নিজে এই বিধান এনেছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

চিত্রাঙ্গদা নিজেও উলূপীকে ধর্মশীলা বলেছেন। অর্জুনকে বিবাহ করে পুত্রলাভ করেছিলেন, সেই পুত্রকে মানুষ করেছিলেন নিজে, স্বর্গে তার পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন পরিচয় দেবার জন্য। তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন ক্ষত্রিয়ের ধর্মপালন করতে। উলূপী সারা জীবন ধর্ম পথে ছিলেন এবং স্বামীর পাপের কথাও চিন্তা করে তার উপায় বিধান করেছিলেন। দেবকন্যা হলেও বোধহয় তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতেন না।

গুরুজী থামলে আমি বাহিরে অন্ধকারের দিকে একবার তাকালাম। রাত অনেক হয়েছে। নিস্তব্ধ হয়েছে পৃথিবী। শুধু আমরা কয়েকজন এই উপাসনার মন্দিরে বসে রাত্রির কথা ভুলে আছি। প্রদীপের মৃদু আলো ও ধূপ ধুনার গন্ধে পরিবেশটি এখন আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

আমি ভেবেছিলাম যে গুরুজী বোধহয় এবারে উঠবেন। আরও কয়েকজন তাই ভেবেছিল। কিন্তু গুরুজী বললেনঃ নাগদের ধর্ম-শীলতার আরও একটি উদাহরণ আমার মনে পড়ছে।

তাউজী তৎপর ভাবে বললেনঃ বলুন।

গুরুজী বললেনঃ ছোট গল্প। এই গল্পটি বলেই আজ শেষ করব।

আমরা গল্পের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

গুরুজী বললেনঃ নল দময়ন্তীর কথায় আছে কর্কোটক নাগের

কথা। দময়ন্তীকে ত্যাগ করে নল যখন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন তখন দেখলেন যে এক দাবাগ্নি জ্বলছে আর কে একজন তাঁকে করুণ স্বরে ডাকছে। আগুনের কাছে এসে নল কুণ্ডলীকৃত এক নাগ দেখতে পেলেন। সেই নাগ তাঁকে হাতজোড় করে বললেন, রাজা, দেবর্ষি নারদকে প্রতারিত করবার জন্য আজ আমার এই অবস্থা। যতক্ষণ তুমি আমাকে অন্যত্র না নিয়ে যাবে ততক্ষণ এইখানেই আমাকে স্থাবরের ন্যায় পড়ে থাকতে হবে। তুমি আমাকে মুক্তি দাও, আমি তোমার সখা হয়ে তোমাকে সময়োচিত পরামর্শ দেব।

এই কথা বলে কর্কোটক নাগ তাঁর দেহ সঙ্কুচিত করে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হলেন। আর নল তাঁকে বহন করে দূরে নিয়ে গেলেন। পথে যেতে যেতে কর্কোটক বললেন, আপনি পদক্ষেপ গণনা করে পা ফেলুন।

আর নল যেই দশম পদক্ষেপ করলেন, কর্কোটক অমনি তাঁকে দংশন করলেন। আর দেখতে দেখতে নলের রূপ বিকৃত হয়ে গেল।

এ কী রকমের সখ্যতা! এই কি উপকারীর পুরস্কার!

আমি ভেবেছিলাম যে সাপ সাপের মতই আচরণ করেছে। কিন্তু গুরুজী বললেনঃ কর্কোটক তাঁর নিজ রূপ ধারণ করে রাজাকে বললেন, ভয় পেও না রাজা, আমি তোমার উপকার করলাম। লোকে যাতে তোমাকে চিনতে না পারে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা করলাম। কলি তোমার দেহে প্রবেশ করেছে, এখন সে আমার বিষে জর্জরিত হয়ে থাকবে। তুমি অযোধ্যায় যাও রাজা ঋতুপর্ণের কাছে, বাহুক নামে সারথি হয়ে তাঁর কাছে থাক। তিনি তোমার কাছে অশ্বহৃদয় শিখে অক্ষহৃদয় দান করবেন।

বাধা দিয়ে তাউজী বললেনঃ এই অশ্বহৃদয় আর অক্ষ-হৃদয় কী?

গুরুজী বললেনঃ গুপ্ত বিদ্যা। নিষধরাজ নল অশ্ব চালনার গুপ্ত বিদ্যা জানতেন, আর ঋতুপর্ণ জানতেন অক্ষক্রীড়ার গুপ্ত বিদ্যা।

তাউজী বললেন : কী হবে এই সব বিদ্যা শিখে ?

গুরুজী বললেন : সেকালের রাজাদের এই সব বড় প্রিয় ছিল। কর্কোটক নাগ বলেছিলেন, পাশা খেলায় পারদর্শী হয়ে তুমি শ্রেয়ো লাভ করবে, তোমার রাজ্য স্ত্রী পুত্র কন্যা সবই ফিরে পাবে। তখন তুমি নিশ্চয়ই তোমার পূর্ব রূপ ফিরে পেতে চাইবে। সে ইচ্ছা হলেই তুমি আমাকে স্মরণ করে এই বসন পরিধান কোরো।

বলে কর্কোটক নাগ নল রাজাকে এক জোড়া দিব্যবস্ত্র দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

নল দময়ন্তীর গল্প আমার মনে ছিল না। এই সব গল্প আমরা শৈশবে পড়েছি, আর ভুলে গেছি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। পরের ঘটনা জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করবার আগেই গুরুজী বললেন : অনেক দিন পরে নল বুঝতে পেরেছিলেন যে কর্কোটক তাঁর কী উপকার করেছেন ! ঋতুপর্ণ রাজার কাছে অক্ষহৃদয় পেতেই কলি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন, কর্কোটকের বিষে তখন তিনি বমি করছেন। কিন্তু অন্যের অদৃশ্য হয়ে নলকে বললেন, রাজা, আমাকে অভিশাপ দিও না। আমি তোমাকে বর দিচ্ছি যে তোমার নাম করলে তার কলি ভয় থাকবে না।

নল তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেতে চাইলেন দময়ন্তীর সঙ্গে মিলন হবার পরে। কর্কোটকের দেওয়া বস্ত্র তাঁর সঙ্গে ছিল, সেই বস্ত্র পরিধান করে তিনি কর্কোটককে স্মরণ করলেন। দেখতে দেখতেই তাঁর বিকৃত রূপ পরিবর্তিত হয়ে পূর্বের রূপশ্রী তিনি ফিরে পেলেন। দময়ন্তী তাঁকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে লাগলেন।

গুরুজী এইবারে উঠে দাঁড়ালেন। আমরাও উঠলাম।



সকাল বেলায় বাগানে কাজ করতে করতে পাধ্যে আমাকে বললেন : আর একটি নাগের কথা আমি জানি, কিন্তু গুরুজী তার কথা বললেন না।

আমি বললাম : নাগের কথা কি শেষ হয়ে গেছে ?

পাধ্যে বললেন : বোধহয় হয়েছে।

আমি বললাম : তাহলে বোধহয় তাঁর মনে পড়ে নি। আজ বলবেন।

পাধ্যে বললেন : শ্রীমদ্ভাগবত পড় নি ?

লজ্জিত ভাবে আমি বললাম : না।

পাধ্যে আমার লজ্জা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন : এখানে লজ্জার কিছু নেই। আমরা সবাই অজ্ঞ। এ কথা মেনে নেবার সাহস যার আছে, তার অজ্ঞতা তাড়াতাড়ি দূর হবে।

আমি নীরবে ছিলাম। খুরপি দিয়ে ঘাস তুলতে তুলতে পাধ্যে বললেন : যারা সব জানার ভান করে থাকে, তাদের মূর্খ থাকতে হয় চিরকাল। কেউ তাদের কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করে না, সাহসও পায় না। আর যে জেনেও তা প্রকাশ করে না, তার জ্ঞান প্রতি দিন বাড়ে, প্রতি পদক্ষেপে। সবাই তাকে কিছু বলবার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে।

আমি বললাম : খুব খাঁটি কথা।

খুশী হয়ে পাধ্যে বললেনঃ কালীয় দমনের গল্প শোন নি? শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

আমি বললাম ঃ কালীয় দমন কথাটি শুনেছি, কিন্তু তার বেশি কিছুই জানি নে।

কাজ করতে করতেই পাধ্যে আমাকে গল্পটি শোনালেন।

বিষধর সর্পরাজ কালীয় ছিল সমুদ্রবাসী। গরুড়ের কাছে পরাজিত হয়ে যমুনার নিকট এক হ্রদে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু গরুড় তার অপেক্ষায় হ্রদের তীরে এসে বসে থাকতেন, আর ক্ষুধা পেলে মাছ ধরে খেতেন। মাছের উপরে এই অত্যাচার দেখে সৌভরি মুনি শাপ দিলেন, তাঁর শাপে হ্রদের জল বিষাক্ত হয়ে গেল। কাজেই গরুড়কে নিতে হল বিদায়।

এত দিন গরুড়ের ভয়ে কালীয় লুকিয়ে ছিল। এবারে কালীয়র ভয়ে সে অঞ্চল জনশূন্য হতে লাগল। তার মুখ থেকে সারাক্ষণ আগুন আর ধোঁয়া বার হত। কারও সাধ্য ছিল না যে হ্রদের জলে নেমে স্নান করে।

একদিন এক দল রাখাল তৃষ্ণার্ত হয়ে এল সেই হ্রদের জল পান করতে। গরু নিয়ে রাখালরা সেই জল পান করে সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হল। এই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ এসে হ্রদের জলে লাফিয়ে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কালীয় তাঁকে বেষ্টন করে ফেলল। কৃষ্ণ অনায়াসে তার ফণার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরের ভারে রক্ত বমন করতে করতে কালীয় নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাইল। কৃষ্ণ বললেন, তুমি তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাও।

কালীয় বলল, কিন্তু গরুড় যে আমাকে খেয়ে ফেলবে!

কৃষ্ণ অভয় দিয়ে বললেন, খাবে না। তোমার মাথায় আমার পায়ের চিহ্ন দেখলে গরুড় তোমাকে কিছু বলবে না।

কালীয় সেই হ্রদ ত্যাগ করে সমুদ্রে ফিরে গেল।

পাধ্যের গল্প শেষ হতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এই গল্পে কি কিছু প্রমাণ হচ্ছে?

পাধ্যে বললেন : প্রমাণ এইটুকুই হচ্ছে যে গরুড়ের ভয়ে কালীয় নাগ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার মুখে বিষ, নিঃশ্বাসে আগুন। সেই ভয়েই দেশ জনশূন্য হয়েছে। গরু ও রাখাল বালকেরা মরেছে হ্রদের জল পান করে, সেই জল বিষাক্ত হয়েছে ঋষির শাপে। কালীয়র কোন দোষ আমরা দেখতে পাই কি!

আমি বললাম : না।

পাধ্যে বললেন : মতান্তরে কালীয়র বিষাগ্নিতে হ্রদের জল বিষাক্ত হয়েছিল। এমন কি বাতাসও বিষাক্ত হয়েছিল। তাতেই প্রাণীরা প্রাণ হারাতো। সে যাই হোক, কালীয় কৃষ্ণকে দংশন করে নি। পরাজিত হয়ে বলেছিল, বিধির বিধানে আমরা খল, তমোগুণে ক্রোধী। কিন্তু এর জন্যে তো আমরা দায়ী নই! আপনার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য করব।

আমি বললাম : এর চেয়ে সত্য কথা আর কিছু নেই। জন্মের জন্য দায়ী সৃষ্টিকর্তা, আর নিজের কর্মের জন্য দায়ী প্রাণী।

কালীয় দমনের একটি প্রাচীন চিত্র আমি দেখেছিলাম। নরাকৃতি নাগ কালীয়, সাপের মতো তার বিরাট লেজ আর মাথার উপরে ছাতার মতো ফণা। পাশাপাশি অনেকগুলি মুখ সেই ফণায়, কিন্তু নিচে মানুষের মুখও আছে। কৃষ্ণ বালক নন, পূর্ণাবয়ব পুরুষ নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন ফণার উপরে. বাম হাতে ধরে আছেন লেজের অগ্রভাগ, কালীয়র দুটি হাত যুক্ত প্রণামের ভঙ্গিতে। বিষ্ণুর যেমন মৎস্য কূর্ম ও বরাহ অবতার, এ তেমনি কৃষ্ণের কালীয় দমন রূপ। কথাটা ঠিক হল না। মৎস্যাবতারে যেমন নরাকৃতি বিষ্ণুর নিম্নাঙ্গ মৎস্যের মতো, তেমনি নরাকৃতি কালীয়র নিম্নাঙ্গ ও মাথার উপরে ফণা সাপের মতো।

আমার মনে হল যে দেবাসুরের মতো নাগও একটি স্বতন্ত্র জাতি। কোন বিশেষ দেশে তাদের বাস ছিল। তাদের শিরোভূষণ ছিল সাপের ফণার মতো, আর লেজের মতো দেখতে পরিধেয় বস্ত্র। স্বভাবত এরা সাপের মতো হিংস্র ছিল, কিংবা বাণে সাপের বিষ

ব্যবহার করত বলে নানা স্থানে নিন্দিত হয়েছে। সবাই কিন্তু নিন্দার পাত্র নয়।

আসামে এখনও আছে নাগা জাতি। অনেকের ধারণা যে সাপের মতো হিংস্র তারা, কিন্তু লেজে না মাড়ালে তারা সাপের মতোই শান্ত। উলূপী ছিলেন নাগকন্যা, মণিপুরের চিত্রাঙ্গদার সপত্নী। উলূপীকে বিবাহ করবার পরে অর্জুন মণিপুরে গিয়েছিলেন, আবার মণিপুরে অর্জুন মৃতকল্প হলে উলূপী এসেই তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। উলূপী কি বর্তমানের নাগা রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, মণিপুরী চিত্রাঙ্গদার প্রতিবেশী? আমি জানি যে এ প্রশ্নের উত্তর আজ কেউ দিতে পারবে না।



দুপুর বেলায় বিশ্রামের জন্য একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়েছিলাম। নানা ভাবনায় অস্থির ছিল মন। ভেবেছিলাম যে এখন আর কিছু ভাবব না, এখন শুধু ভাবনাকেই ভুলে থাকব। কিন্তু বইখানা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখলাম যে মন সে দিকে যাচ্ছে না। প্রাচীন ভারতের একটা অদ্ভুত সমাজের চিন্তাতেই মনটা ডুবে আছে। কত বিচিত্র জাতি ছিল পুরাকালে। কত অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী! বইখানা বন্ধ করে আমি বাহিরের দিকে মুখ করে শুলাম। বই পড়ব না, ভাববও না কিছু। খানিকক্ষণ আমি সব কিছু ভুলে থাকব।

আমার মনে হল যে দরজার পাশ থেকে কেউ সরে গেল। কি জানি কী মনে করে আমি চেন্নুলুর দিকে একবার ফিরে দেখলাম।

শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে কিছু ভাবছে কি ভাবছে না, তাও বোঝা যাচ্ছে না। আমি আবার বাহিরের দিকে তাকালাম।

অল্পক্ষণ পরেই সুপ্তি এল ব্যস্ত ভাবে। বলল : তোমরা ঘুমচ্ছ নাকি ?

আমি কোন উত্তর দিলাম না। চেন্নুলুও চুপ করে রইল।

সুপ্তি বলল : আশ্চর্য ব্যাপার ! গুরুজীকে আমি কী বলব ?

বলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি বললাম : তোমার কি এখানে গোয়েন্দার কাজ ? তাহলে যা দেখতে পাচ্ছ তাই বোলো।

গানের মতো সুর করে সুপ্তি বলল : উদাস নয়নে সারা দিন বসে থাকি—

আমিও তেমনি করে বললাম : আর ব্যাকুল হইয়া সারা দিন ঘুরে মরি—

সহসা গম্ভীর হয়ে সুপ্তি বলল : বানর দেখেছ বিনায়ক, কিষ্কিন্ধ্যার বানর ?

আমি বললাম : কেন বল তো ?

গুরুজী জানতে চাইছেন। বলছেন, ওরা উপদেবতা ছিল, না অপদেবতা, তা স্থির করা দরকার।

বলে আড়চোখে তাকাল চেন্নুলুর দিকে।

চেন্নুলু বলল : মাস্টারজীর কাছে যাও। সে বলতে পারবে।

সুপ্তি বলল : ওদের তো দেশ নয়, যাদের দেশ তাকেই জিজ্ঞেস করছি।

চেন্নুলু বলল : আমারও দেশ নয়।

আমার দিকে চেয়ে সুপ্তি বলল : দক্ষিণ দেশী মানেই তো কিষ্কিন্ধ্যা-বাসী। তাই না বিনায়ক ?

চেন্নুলুর উত্তর শোনবার জন্য আমি কোন কথা বললাম না।

চেন্নুলু আমাকে বলল : গুরুজীকে আজ ডাকিনী যোগিনীর কথা বলতে বোলো। ওরা এই অঞ্চলের একটা বিশিষ্ট জাতি ছিল।

সুপ্তি বলল ঃ দাঁড়াও, তোমার মজা দেখাচ্ছি। শকুন্তলাদিকে বলে দিচ্ছি তোমার কথা। অমন ভাল মানুষকে তুমি ডাকিনী বললে ?

চেন্নুলু বলল ঃ শকুন্তলাদিকে আমি ডাকিনী বলেছি !

কিন্তু সুপ্তি তখন বেরিয়ে গেছে। চেন্নুলুর কথা সে শুনতে পায় নি।

চেন্নুলু এবারে আমাকে বলল ঃ দেখলে বিনায়ক, কী পাজি মেয়ে ! নিশ্চয়ই শকুন্তলাদির কাছে গিয়ে লাগাবে !

আমি বললাম ঃ সত্যি সত্যিই কি আর লাগাবে, ও তামাশা করেছে তোমার সঙ্গে।

চেন্নুলু বলল ঃ তুমি জান না ওকে, ও মেয়ে সব পারে।

সুপ্তি হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে বলল ঃ ডাকছে তোমাকে।

আমি বললাম ঃ কে ডাকছে—কাকে ?

সুপ্তি বলল ঃ শকুন্তলাদি বিনায়ককে ডাকছে। মিথ্যে কথা বোলো না যেন !

চেন্নুলুও লাফিয়ে উঠে বলল ঃ খবরদার ! মিথ্যে কথা বোলো না।

আমি সত্যি কথাই বলব।

চেন্নুলু বলল ঃ কী বলবে ?

বলব, সুপ্তি তোমাকে বাঁদর বলেছে বলে তুমি তাকেই ডাকিনী বলেছ।

সাবাস !

বলে চেন্নুলু আবার শুয়ে পড়ল।

সুপ্তি বলল ঃ দাঁড়াও তবে, গুরুজীকে আমি বলে আসছি।

বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শকুন্তলাদির কাছে আমি যখন পৌঁছলাম গভীর মনোযোগে তখন তিনি একখানা মোটা বই পড়ছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে একবার মুখ তুলে তাকালেন, তারপরে বললেন ঃ আজ তোমার পড়াশুনো নেই ?

আমি বললাম ঃ আপনি ডেকেছেন বলে চলে এলাম।

আমি ডেকেছি!

শকুন্তলাদি সবিস্ময়ে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

লজ্জা পেয়ে আমি বললাম: তাহলে বোধহয় অন্য কেউ আমাকে ডেকেছেন।

বলে আমি চলে আসছিলাম, কিন্তু শকুন্তলাদি আমাকে যেতে দিলেন না, বললেন: বোসো না একটু। কী পড়ছিলে শুনি।

আমি তাঁর কাছে বসে পড়লাম, বললাম: ভাবছিলাম একটা কথা। ভূত প্রেত পিশাচের কথা বললেন গুরুজী, কিন্তু ডাকিনী যোগিনীর কথা তো বললেন না?

তোমারও এ কথা মনে এসেছে বুঝি?

আমি বললাম: কেন বলুন তো!

শকুন্তলাদি বললেন: এ কথা আমারও মনে এসেছিল। গুরুজীর কাছে জেনে নিয়েছি এই কথা।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

শকুন্তলাদি বললেন: ডাকিনীরা হলেন কালীর গণবিশেষ, মানে এক জাতের পিশাচ। এঁরাও হরপার্বতীর অনুচর। যোগিনীরা দুর্গার সহচরী। এঁদের সংখ্যা চৌষট্টি। দুর্গা পূজোর সময় এই চৌষট্টি যোগিনীরও পূজোর বিধান আছে। দুর্গাকে এঁরা প্রয়োজন মতো সাহায্য করেন।

শকুন্তলাদি থামলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন: আর কোন জাতির কথা কি তোমার মনে পড়েছে?

আমি বললাম: বানরেরা কোন্ জাতি ছিল?

শকুন্তলাদি হেসে বললেন: বানর জাতি।

লজ্জা পেয়ে আমি বললাম: আজ আমরা যে বাঁদর দেখি, ঠিক তাই কি?

শকুন্তলাদি বললেন: তা বোধহয় নয়। রামায়ণে তাদের জন্মকাহিনী পড়ে মনে হয় যে তারাও মানুষের মতো ছিল। বালী ও সুগ্রীবের জন্মের কথা জান তো?

বললাম ঃ জানি নে।

শকুন্তলাদি একটা ঢোক গিলে বললেন ঃ ইন্দ্রের ছেলের নাম বালী আর সুগ্রীব হল সূর্যের ছেলে। রামায়ণ তো আছে, পড়ে দেখো এই গল্প।

আমি বললাম ঃ দেখব।

তারপরে বললেন ঃ ভল্লুক নাম শুনেছ ?

বললাম ঃ শুনেছি।

ভল্লুকদের কে রাজা ছিল বলতো !

আমি বললাম ঃ বনের পশুর আবার রাজার নাম কী !

শকুন্তলাদি হেসে বললেন ঃ তাহলে তো ভল্লুক নাম শোন নি দেখছি। ভল্লুক রাজের নাম ছিল জাম্ববান। তাঁর মেয়ে জাম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন দ্বারকার কৃষ্ণ।

আমি এবারে গভীর বিস্ময়ে তাকালাম শকুন্তলাদির মুখের দিকে। তাই দেখে শকুন্তলাদি বললেন ঃ এ হল মহাভারতের গল্প। ত্রেতা যুগে তিনি সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন, রামের পক্ষ নিয়ে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আর দ্বাপরে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে। কঠোর তপস্যা করে সত্রাজিৎ নামে একজন যাদব স্যমন্তক মণি পেয়েছিলেন। গলায় এই মণি ধারণ করে তাঁর ভাই প্রসেনজিৎ বনে এসেছিলেন মৃগয়ায়। একটি সিংহ তাঁকে বধ করে এই মণি পেয়েছিল, আর সিংহকে মেরে জাম্ববান সংগ্রহ করেছিলেন এই মণি। দ্বারকায় সবাই ভাবল যে কৃষ্ণ এই মণির জন্যে প্রসেনজিৎকে হত্যা করিয়েছেন।

কেন তা ভাবল ?

ভাবল এই জন্যে যে কৃষ্ণ নাকি একবার সত্রাজিতের কাছে এই মণিটি চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি তো আর কোন অন্যায় করেন নি ! তাই ব্যাপারটা জানবার জন্যে তিনি বনে গিয়ে জাম্ববানকে দেখলেন, তাঁর গলায় স্যমন্তক মণি। কাজেই যুদ্ধ বাধল। একুশ দিন প্রবল যুদ্ধ হবার পরে জাম্ববান হার স্বীকার করে মণিটি কৃষ্ণকে দিলেন, আর সেই সঙ্গে নিজের কন্যা জাম্ববতীকেও তাঁর হাতে সম্প্রদান

করলেন। জাম্ববতীর দশটি ছেলে হয়েছিল। তার মধ্যে শাম্ব প্রধান। যদুবংশ ধ্বংস হবার পর অর্জুন জাম্ববতীকে হস্তিনাপুরে এনেছিলেন। সেখানে তিনি আগুনে প্রবেশ করে প্রাণ দিয়েছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ভল্লুকেরাও কি মানুষ নাকি?

শকুন্তলাদি হেসে বললেন: গুরুজীকে জিজ্ঞেস কোরো। এই রকমের জাতি এ দেশে আরও কত ছিল তাও জেনে নিও।

তারপরে নিজেই বললেন: এ দেশের প্রাচীন সমাজটা যে সত্যিই বিচিত্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই।



আমি ফিরে আসতেই চেন্নুলু আবার উঠে বসল। বলল: লাগিয়ে এসেছে তো?

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না, বললাম: শকুন্তলাদিও অনেক কিছু জানেন।

চেন্নুলু তার উত্তরের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম: শকুন্তলাদি বললেন, কিষ্কিন্ধ্যাবাসীরা দক্ষিণ ভারতের লোক ছিল না। তারা স্বর্গ থেকে কিষ্কিন্ধ্যায় গেছে। আর ডাকিনী-যোগিনীর কথায় বললেন, ওরা সব কালী ও দুর্গার অনুচর, দুর্গা পুজোর সময় চৌষট্টি-যোগিনীর পুজো করতে হয়।

চেন্নুলু নিরুৎসাহ হয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু আমার মনে শান্তি এল না। প্রাচীন ভারতের সমাজটা

যেন আরও জটিল হয়ে উঠছে। বানরেরা নিশ্চয়ই দেবযোনি নয়, কিন্তু শক্তিতে তারা দেবতার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না। অসুরের কথা বলবার সময় গুরুজী আমাদের বানর রাজ বালীর কথা কিছু বলেছিলেন। যে রাবণের ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কিত হয়ে উঠতেন, সেই রাবণ বালীর কাছে নাকানি-চোবানি খেয়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাবণের পুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্ধন করে এনেছিলেন লঙ্কায়, ইন্দ্রজিৎ নামে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। আর বালী সেই রাবণকে লেজে জড়িয়ে সাত সমুদ্রের জল খাইয়েছিলেন। কিন্তু রাবণ ছাড়া পেয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে তাঁর ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র মেঘনাদও বালীকে কাবু করতে পারবে না।

বালী বিবাহ করেছিলেন তারাকে, অঙ্গদ তাঁদের পুত্র। এই তারা শুনেছি প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চ কন্যার অত্যতম। কেন তিনি এই সম্মানের পাত্রী হয়েছেন সে কথা আমার জানা নেই।

সুগ্রীবের স্ত্রীর নামও আমি শুনেছিলাম। রুমা তাঁর নাম। এঁদের সামাজিক রীতি নীতি মানুষের মতো ছিল বলেই আমার ধারণা। আকারে আকৃতিতেও বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তবে প্রয়োজন মতো এঁরা নিজেদের শরীর বাড়াতে কমাতে পারতেন। হনুমানের কথায় আমরা তা জেনেছি। অদ্ভুত চরিত্র এই হনুমানের। কিন্তু গুরুজী কি আমাদের বানরের কথা বলবেন না ?

ঠিক এই মুহূর্তে আমার গুরুজীর কাছে যেতে ইচ্ছা হল। ভাবলাম যে উপাসনার মন্দিরে তো কিছু বলা সম্ভব নয়, এই সময়ে তাঁকে বানরের কথা বলবার জন্য অনুরোধ করে আসি। সহসা সুপ্তির গলা শুনতে পেলাম। দরজার বাহিরে থেকে সে বলল: চল, গুরুজী তোমাকে ডাকছেন।

চেহুলু লাফিয়ে উঠে বলল : আমাকে !

বিনায়ককে।

বলে সে সরে গেল।

আমার বিস্ময়ের যেন অন্ত নেই। গুরুজী কি আমার মনের কথা জানতে পেরেছেন!

চেন্নুলু বলল: কী সাংঘাতিক মেয়ে দেখলে তো! গুরুজীর কাছেও গিয়ে লাগিয়েছে।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু গুরুজীর ঘরের দিকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালাম। সুপ্তি ঠিক বলেছে! না শকুন্তলাদির মতো হবে! গুরুজীর কাছে তো আমি মিথ্যা বলতে পারব না, আর সুপ্তিও নিশ্চয়ই তাঁর নামে মিথ্যা বলবে না। সাহসে ভর করে আমি এগিয়ে গেলাম।

গুরুজীর ঘরে তাউজীও বসে ছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মুখে বললেন: এসো, বোসো এইখানে।

বলে আমাকে তাঁর পাশে বসতে দিলেন।

গুরুজী বললেন: গত কয়েক দিন তুমি আমার কাছে আস নি, তোমার কি জানবার কোন কথা নেই?

জানবার কথার কি আর শেষ আছে! কিন্তু সব প্রশ্ন আমার গোলমাল হয়ে গেল। আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না।

তাউজী বললেন: প্রাচীন সমাজের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা জন্মেছে কি?

কী বলব ভেবে না পেয়ে আমি বললাম: কখনও সবাইকে মানুষ মনে হচ্ছে, আবার কখনও মনে হচ্ছে যে মানুষ কেউ নয়।

গুরুজী হেসে বললেন: তবে কি দেবতা মনে হচ্ছে?

না।

অসুর?

তাও না।

গুরুজী বললেন: তবে তো ঠিকই বুঝেছ যে যাদের সম্বন্ধে এখন আলোচনা হচ্ছে, তারা দেবতা অসুর বা মানুষ নন। কোন একটি বিশেষ নামে যদি তাঁদের অভিহিত করতে হয় তো তাঁদের উপদেবতা বা অতিমানুষ বলা উচিত। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের

সাদৃশ্য যত, তার চেয়ে বেশি সাদৃশ্য দেবতার সঙ্গে। এ সাদৃশ্য রূপের নয়, শক্তির। দেবতাদের মতো তাঁরা অনেক ক্ষমতার অধিকারী।

এই প্রসঙ্গে আমার বানরদের কথা মনে পড়ল। আমি বললাম: বানরদের আমরা কী বলব?

গুরুজী আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপরে বললেন: ঠিক বলেছ। বানরদের সাদৃশ্য মানুষের সঙ্গেই বেশি। কিন্তু অসীম ক্ষমতাশালী ছিল তারা।

তাউজী বললেন: এই জন্যেই কি রাম লুকিয়ে থেকে বালী বধ করেছিলেন?

গুরুজী বললেন: এ ধারণা অন্যায় নয়। রামের বালী বধ তাঁর চরিত্রের কলঙ্ক। সম্মুখ যুদ্ধে বালীকে পরাজয়ের সাহস থাকলে রাম এ কাজ করতেন কিনা সন্দেহ। কোন যুক্তি দিয়ে রামকে আমরা কলঙ্ক মুক্ত করতে পারি না।

তাউজী বললেন: বালীকে বধ না করে তো রাম বালীর সাহায্য নিয়েই সীতাকে উদ্ধার করতে পারতেন!

গুরুজী বললেন: এই কাজে সুগ্রীব তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর রাবণ বালীর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন বলে বালীর সাহায্য তিনি আশা করেন নি।

তাউজী বললেন: বালীকে তিনি সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করলেন না কেন?

গুরুজী আমার দিকে চেয়ে বললেন: তোমার কী মনে হয়?

আমি লজ্জা পেলাম গুরুজীর এই প্রশ্ন শুনে। কিন্তু তিনি বললেন: লজ্জা কিসের! তোমারও তো একটা মত আছে!

সসঙ্কোচে আমি বললাম: সীতাকে হারিয়ে রাম নিজের ওপরে আস্থা হারিয়েছিলেন, সাধারণ বিচার বুদ্ধিও বোধহয় শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

গুরুজী উজ্জ্বল চোখে তাকালেন আমার দিকে, বললেন: খুবই যুক্তি সম্মত কথা।

তারপরে তাউজীকে বললেন : খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও বোধহয় বানরদের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা দরকার।

তাউজী বললেন : একটা দিন তাহলে বেশি লাগবে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম : লাগুক বেশি। হনুমানের চরিত্রটি বড় অপূর্ব। তাঁকে তো আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি, মহাবীর নামে পূজো হয় তাঁর।

গুরুজী বললেন : সত্যি কথা।

তারপরে বললেন : তোমার লেখা কেমন হচ্ছে? একদিন আমাকে দেখাবে না?

মাথা নেড়ে আমি বললাম : দেখাব।

নিজেদের ঘরে ফিরে এসে আমি আশ্চর্য হলাম। চেন্নুলুর সঙ্গে গল্প করছিল সুপ্তি। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল : আমার কথা বিশ্বাস হয় নি তো! শোন বিনায়কের কাছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ কথা?

আশ্রম থেকে ওকে তাড়িয়ে দেবার কথা।

বলে সুপ্তি পালিয়ে গেল।



সায়াহ্নের অন্ধকার নামতেই গুরুজী এলেন উপাসনার মন্দিরে। আসন গ্রহণ করেই বললেন : নাগের পরে গন্ধর্বের কথা বলব ভেবেছিলাম,

কিন্তু তার আগে বানর জাতির কথা বলব সংক্ষেপে।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমি পুলকিত হলাম। আর চেম্বুলু গভীর বিস্ময়ে তাকাল আমার মুখের দিকে। শকুন্তলাদির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তিনিও প্রচুর খুশী হয়েছেন।

গুরুজী বললেনঃ বানরেরা দেবযোনি নয়, অসুরও নয় তারা। কিন্তু প্রবল শক্তির অধিকারী। রামায়ণের যুগে আমরা দেখতে পাই যে লঙ্কার রাজা রাবণের রাজ্য সমুদ্রের পরপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতের মাটির শেষ প্রান্তেও তাঁর কোনও অধিকার ছিল না। রাম এই জন্যেই যুদ্ধের জন্য বিনা বাধায় সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব ছিলেন তাঁর সঙ্গে। সমগ্র দক্ষিণ ভারত যে তখন কিষ্কিন্ধ্যার অধীনে ছিল, তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার মধ্যে আর কোন রাজা থাকলে রাম তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সখ্যতা স্থাপন করতেন।

এমন বিস্তৃত রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার প্রথম রাজা ঋক্ষরজা। তাঁর জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক। ব্রহ্মার দিব্য সভা ছিল সুমেরু পর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে, এক শত যোজন তার বিস্তার। এই সভায় বসে ব্রহ্মা যোগাভ্যাস করতেন। একদিন তাঁর যোগের সময় একবিন্দু অশ্রু তাঁর চোখ থেকে পড়েছিল। ঋক্ষরজার উৎপত্তি সেই অশ্রু থেকে। ব্রহ্মার আদেশে ফলমূল খেয়ে তিনি সুমেরু পর্বতেই বাস করতে লাগলেন। তার পরে একদিন আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটল। ঋক্ষরজা বেড়াতে বেরিয়ে উত্তর শিখরে এক সরোবরের তীরে পৌঁছুলেন, আর তার স্বচ্ছ জলে দেখলেন নিজের প্রতিবিম্ব। ভাবলেন যে অন্য একটি বানর তাকে অপমান করছে। যেই এ কথা তাঁর মনে হল, অমনি তিনি লাফিয়ে পড়লেন জলে। আর জল থেকে যখন উঠলেন, তখন তিনি একটি রূপসী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন।

এ সব অলৌকিক কথা এখন অসম্ভব বলে মনে হয়। শুধু রূপের পরিবর্তন নয়, অবগাহন করে পুরুষ নারীতে পরিণত হতে পারে, এ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ধারণায় অভ্যস্ত মন তা মানতে চায় না।

হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে পুরুষকে নারী করা হচ্ছে, বা নারীকে পুরুষ। কাজেই একদিন যে অবগাহন করে এই পরিবর্তন সম্ভব হবে না, তা আজ জোর করে বলা যায় না। কিন্তু আমরা এই ধরনের অসম্ভব কথাও শুনছি যে কেউ কোন বিস্ময় প্রকাশ করলাম না।

গুরুজী বললেন : বালী ও সুগ্রীবের জন্ম কথা, রহস্যাবৃত, কিছু অশ্লীলও বটে।

অশ্লীলতার প্রতি আমাদের একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। গুরুজীর কথায় তাই আমরা আরও মনোযোগী হলাম। কিন্তু দেখলাম যে গুরুজী খুব সন্তর্পণে তা এড়িয়ে গেলেন। বললেন : দেবরাজ ইন্দ্র ও সূর্য দুজনেই সেই রূপসী নারীকে দেখে মুগ্ধ হলেন। দুটি পুত্র হল ঋক্ষরজার। ইন্দ্রের পুত্রের নাম বালী ও সুগ্রীব হল সূর্যের পুত্র। তারপরেই ঋক্ষরজা আবার পুরুষে পরিণত হয়ে গেলেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : বানরের উৎপত্তি কথা আমি এই জন্যেই রহস্যাবৃত মনে করি। ব্রহ্মার অশ্রু থেকে এক পুরুষের জন্ম, সেই পুরুষ অলৌকিক উপায়ে নারী হয়ে জন্ম দিলেন দুটি শিশু পুত্রের, এই শিশুদের জনক দুজন দেবতা। কশ্যপ মুনি তেরটি বা সতেরটি কুলের জন্ম দিয়েছিলেন, দেবতা দৈত্য দানব নাগ পশু পক্ষী বৃক্ষ প্রভৃতি প্রায় সব কিছু তাঁরই সন্তান। কিন্তু বানর সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দু থেকে। তাও ঠিক নয়। এর পরের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে কিষ্কিন্ধ্যায় তখন বানরদের বাস ছিল।

ভাউজী আশ্চর্য হয়ে বললেন : কী রকম ?

গুরুজী বললেন : পুনর্বার বানরে পরিণত হবার পর দুই পুত্রের হাত ধরে ঋক্ষরজা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা বললেন, দাঁড়াও, তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বলে এক দেবদূতকে ডেকে তার সঙ্গে সবাইকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ঋক্ষরজা সমস্ত বানরদের রাজা হয়ে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসলেন। এ বানরেরা কোথা থেকে এল তা আমি বলতে পারব না। এ কথাও বলতে পারব না যে এই বানরদের সঙ্গে

ঋক্ষরজা বা বালী ও সুগ্রীবের আকারে আকৃতিতে কোন প্রভেদ ছিল কিনা। তার কারণ বালী ও সুগ্রীবের জননী একজন রূপসী স্ত্রী ও জনক দুজন দেবতা। তাঁদের সন্তান লাঙ্গুল বিশিষ্ট বানর কিনা তা আমার জ্ঞানের অতীত।

তাউজী বললেন: লাঙ্গুল বিশিষ্ট হবার কোন কারণই নেই।

গুরুজী মাথা নেড়ে বললেন: তা বলতে পার না। তার কারণ, যা আমরা আজ অলৌকিক বলে মনে করছি, তার বিচার কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে হয় না।

তারপর বললেন: বালী কাকে বিবাহ করেছিলেন জান?

তাউজী বললেন: তারাকে।

গুরুজী বললেন: এই তারা হলেন বানর রাজ সুষেণের কন্যা।

বানর রাজ!

অত বড় কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে ছোটখাট রাজা বা দলপতি অনেক ছিল বলে মনে হয়। সুগ্রীব তাঁকে ডেকে পাঠালে সুষেণ বহু সহস্র বানর নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় চলে আসেন এবং সীতা উদ্ধারের কাজে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করেন। লঙ্কার যুদ্ধে তিনি রাক্ষস সেনাপতি বিদ্যুন্মালীকে বধ করেন, আর যা করেন তা অন্যের অসাধ্য কাজ। রামের বিপুল সেনাবাহিনীর শিবিরে তিনি ছিলেন একমাত্র চিকিৎসক ও শল্য চিকিৎসক। প্রয়োজন মতো তিনি অস্ত্রোপচার করতেন এবং নানা ঔষধ প্রয়োগে আহত সেনাদের তিনি আরোগ্য করে তুলতেন। রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণ অজ্ঞান ও মৃতপ্রায় হলে তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তিনি হনুমানকে পাঠিয়েছিলেন গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী সাবর্ণকরণী সঞ্জীবকরণী ও সন্ধানী এই মহৌষধিগুলি আনবার জন্য। হনুমান এ সব খুঁজে না পেয়ে ওষধি পর্বতের শৃঙ্গটি তুলে এনেছিলেন। সুষেণ সেই ওষধি পিষে তারই আঘ্রাণে লক্ষ্মণকে বাঁচিয়েছিলেন।

তাউজী বললেন: পুরাকালে এ রকম চিকিৎসকের নাম শোনা যায় না।

গুরুজী বললেনঃ সত্য যুগে দেবতাদের চিকিৎসক ছিলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আর মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানা ছিল বলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য দেবাসুরের যুদ্ধে নিহত অসুরদের বাঁচিয়ে তুলতেন। তারপরে ত্রেতায় আমরা সুষেণের নাম পাই। বাণর সুষেণ ছিলেন অদ্বিতীয় চিকিৎসক।

তাউজী বললেনঃ আপনি ঋক্ষরজার কথা থেকেই বলুন।

গুরুজী বললেনঃ ঋক্ষরজার সম্বন্ধে আর কোন নতুন কথা আমরা পাই নে। তিনি আবার বিবাহ করেছিলেন কিনা, তাঁর আরও সন্তান সন্ততি হয়েছিল কিনা, কত দিন রাজত্ব করেছেন, ইত্যাদি কোন কথাই আমাদের জানা নেই। সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে রাম যখন দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করেছেন, বালী তখন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা এবং সুগ্রীব বালীর ভয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আত্মগোপন করে আছেন। এর পরের ঘটনা বলতে হলে আগের ঘটনাও কিছু জানা দরকার। সে কথা সুগ্রীব নিজেই রামকে বলেছিলেন।

স্ত্রীঘটিত এক ব্যাপারে মায়াবী নামে এক তেজস্বী অসুরের সঙ্গে বালীর শত্রুতা হয়েছিল। একদিন গভীর রাতে মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যায় এসে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করল। সুগ্রীব এবং বালীর পত্নীরা বালীকে ঘরের বাহিরে বেরতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু বালী তাঁদের কারও কথা না শুনে বেরিয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে সুগ্রীবকেও বেরতে হল।

কিন্তু মায়াবী তাঁদের দেখে পালাতে লাগল। চন্দ্রালোকে তাঁরাও মায়াবীকে অনুসরণ করতে লাগলেন। হঠাৎ মায়াবী একটি তৃণাবৃত ভূ বিবরে ঢুকে পড়ল। বালী সুগ্রীবকে বললেন, যতক্ষণ আমি তাকে বধ করে না ফিরি, ততক্ষণ তুমি এইখানে বসে অপেক্ষা কর।

বালীর অপেক্ষায় সুগ্রীব একটি বছর সেইখানে অপেক্ষা করলেন। তারপরে দেখলেন যে বিবর থেকে সফেন রক্ত নির্গত হচ্ছে। অসুরদের গর্জনও শুনতে পেলেন, কিন্তু বালীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন না। সুগ্রীব ভাবলেন যে বালীর মৃত্যু হয়েছে। তাড়াতাড়ি একটি শিলাখণ্ড

দিয়ে বিবর দ্বার বন্ধ করে দিয়ে শোকার্ত ভাই বালীর তর্পণ করে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন।

সুগ্রীব এই ঘটনা গোপন করেছিলেন। মন্ত্রীরা তাঁকে দেশের রাজা করলেন। বালীর পত্নী তারাও তাঁর অন্তঃপুরবাসিনী হলেন।

কিন্তু বালী তো মরেন নি, অনেক খোঁজাখুজির পরে অসুরকে দেখতে পেয়ে তাকে বধ করে দেশে ফিরলেন। ফিরে এসে সুগ্রীবের কাণ্ড দেখে ক্ষেপে গেলেন। সুগ্রীব তাঁকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, পায়ে মাথা রেখে ক্ষমা চেয়েছিলেন নিজের ভুলের জন্য। কিন্তু বালী কিছুতেই তাঁকে ক্ষমা করলেন না। এক বস্ত্রে সুগ্রীবকে নির্বাসিত করলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে সুগ্রীব রাজ্যের লোভে বিবরের মুখ বন্ধ করে এসেছিল।

ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব তাঁর অনুচরদের নিয়ে কেন নিশ্চিন্তে বাস করছিলেন, তারও একটি কাহিনী আছে। দুন্দুভি নামে এক মহিষ রূপী অসুর একবার বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল। মহাকায় সে, সহস্র হস্তীর সমান তার বল। তার ওপরে দেবতার বর পেয়ে গর্বিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমে সে গিয়েছিল সমুদ্রের কাছে, সমুদ্র বললেন, আমি তোমার সঙ্গে পারব না, তুমি শৈলরাজ হিমবানের কাছে যাও। দুন্দুভি হিমালয়ে উপস্থিত হলে হিমবান বললেন, আমি তপস্বীদের আশ্রয়, যুদ্ধ আমার কাজ নয়। তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর কাছে যাও। এই কথা শুনেই দুন্দুভি বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল। দুন্দুভির মতো তার নিনাদ শুনে বালী এগিয়ে এসেছিলেন। প্রথমে দুজনের বচসা হয়, তার পরে হয় যুদ্ধ। পর্বতাকার দুন্দুভির শৃঙ্গ ধরে বালী তাকে আছাড় দিয়ে বধ করেন ও এক যোজন দূরে সেই মৃত মহিষকে নিক্ষেপ করেন। দুন্দুভির এক বিন্দু রক্ত বাতাসে চালিত হয়ে মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে এসে পড়ল। আশ্রমের বাহিরে এসে ঋষি সেই মৃতদেহটি দেখতে পেলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষি শাপ দিলেন, যে তাঁর আশ্রম দূষিত করেছে সে এক যোজনের মধ্যে এলে তার মৃত্যু অনিবার্য। তার অনুচরেরাও এখানে আসতে পারবে না।

ঋষির শাপের কথা বালী শুনতে পেয়েছিলেন। ঋষিকে প্রসন্ন করবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাতে ফল হয় নি। এর পরে বালী আর ঋষ্যমূক পর্বতের কাছে আসেন নি। নির্বাসিত হবার পরে সুগ্রীবও তাই অনুচরদের নিয়ে নিরাপদে এখানে বাস করছিলেন।

রাম যখন পম্পা সরোবরের তটদেশ অতিক্রম করে চলেছিলেন, সুগ্রাব তাঁদের দেখতে পেলেন ঋষ্যমূক পর্বত থেকে। অসি ধনুর্বাণে সজ্জিত চীরধারী এই দুই যুবককে দেখে সুগ্রীব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তিনি এঁদের বালীর চর ভেবেছিলেন।

সুগ্রীবের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে তাঁর অনুচর হনুমান বলেছিলেন, তুমি তোমার বানর সুলভ লঘু চিত্তের জন্য এ রকম অস্থির হয়েছ। নিজের বুদ্ধি দিয়ে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় বোঝ, রাজার মতো আচরণ কর।

সুগ্রীব বললেন, ওদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে। তুমি ওদের কাছে পরিচয় জেনে এস।

গুরুজী বললেন: রামায়ণে আমরা দেখতে পাই যে হনুমান তাঁর নিজ রূপে রাম লক্ষ্মণের কাছে যান নি, গিয়েছিলেন ভিক্ষু রূপ ধারণ করে। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে বানরেরা ইচ্ছা মতো রূপ ধারণ করতে পারত, আর এই জন্যে সুগ্রীবও রাম লক্ষ্মণকে দেখে ছদ্ম বেশে বালীর চর এসেছে ভেবেছিলেন।

ভাউজী বললেন: এই ক্ষমতা তাদের কোথা থেকে এল?

গুরুজী বললেন: পুরাকালে এই ক্ষমতা প্রায় সকল জাতিরই ছিল। রাক্ষসেরাও এই ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলে তাদের কামরূপী বলা হত। হনুমানও কামরূপী, তিনিও ইচ্ছা মতো দেহ ধারণ করতে পারেন। হনুমানের জন্ম কথা পরে বলব।

সুগ্রীবের আদেশে তিনি রাম লক্ষ্মণের নিকটে এসে প্রণাম করে সবিনয়ে বললেন, তোমাদের মাথায় জটা, হাতে ইন্দ্রধনুর মতো শরাসন তূণীর ও নির্মোকমুক্ত ভুজঙ্গের মতো খড়্গ। তোমাদের দেখে রাজর্ষি দেবতা ও তপস্বী মনে হচ্ছে। তোমরা কে, কেন এসেছ এইখানে?

হনুমানের কথা শুনে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, এঁর কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ইনি বেদাধ্যয়ন করেছেন, ব্যাকরণও কণ্ঠস্থ করেছেন বলে একটিও অপশব্দ বলেন নি। কথা বলার সময় এঁর মুখ চোখ ললাট ও ভ্রূ বিকৃত হল না, অসন্দিগ্ধ ভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করলেন, আর সমস্ত ধ্বনি যথাস্থান থেকে যথাযথ ভাবে নির্গত হল। ইনি দ্রুত কথা বললেন না, বিলম্বিতও নয় এঁর কথা। যে ভাবে বললেন তা শুনে মনে বড় আনন্দ হল।

গুরুজী বললেন: বানর জাতির সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, রামের এই কথাগুলি শুনলে তা মুহূর্তে অন্তর্হিত হবে। রাম লক্ষ্মণকে ঋষ্যশৃঙ্গ পর্বতের পথ দেখিয়ে দেবার সময় কবন্ধ বলেছিল যে বানরদের অধিপতি বলে সুগ্রীবকে তুমি হেয় জ্ঞান কোরো না। রাম এখন নিজেই দেখতে পেলেন যে সুগ্রীবের যে অনুচর তাঁদের পরিচয় জানতে এসেছেন, তিনি শিক্ষিত ও ভদ্র, তাঁর সংলাপ ও সৌজন্য প্রশংসার যোগ্য।

পরস্পর পরিচয় হবার পরে হনুমান নিজ রূপ ধারণ করলেন ও রাম লক্ষ্মণকে কাঁধে করে সুগ্রীবের কাছে বয়ে আনলেন। সুগ্রীব তাঁদের নিজ রূপে দেখা দেন নি, সুদর্শন রূপ ধারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, তুমি আমার মতো বানরের সঙ্গে বন্ধুতা করতে চাইছ জেনে আমি সম্মানিত হয়েছি, তোমার সঙ্গে বন্ধুতায় স্বজনবর্গের কাছে আমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

দুজনে পাণি পীড়ন করে গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন। হনুমান দুটি কাঠ ঘর্ষণ করে আগুন জ্বাললেন। ফুল দিয়ে অর্চনা করে সেই আগুন রাখলেন দুজনের মাঝখানে। রাম ও সুগ্রীব সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ করে পরস্পরকে দেখতে লাগলেন। সুগ্রীব বললেন, আজ আমাদের সুখ দুঃখ এক হল, আমরা মিত্র হলাম।

তাউজী বললেন: পাণি পীড়নের বিদেশী প্রথা কি সেকালে এ দেশেও প্রচলিত ছিল?

গুরুজী বললেন: বাল্মীকি রামায়ণে এই কথা আছে। দুজনে

দেখা হবার পরেই সুগ্রীব তাঁর হাত রামের দিকে প্রসারিত করে বলেছিলেন আমার সঙ্গে বন্ধুতা যদি তোমার প্রীতিকর হয়, তবে এই হাত গ্রহণ করে চিরস্থায়ী পাণি-মর্যাদা বন্ধন কর।

প্রসন্ন মনে রাম শুধু তাঁর পাণি পীড়ন করেন নি, আলিঙ্গন করে বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

তাউজী বললেনঃ বৈদিক বিবাহে বর এখনও কন্যার পাণি গ্রহণ করে।

গুরুজী বললেনঃ বন্ধুদের পাণি পীড়ন এ দেশেরই প্রাচীন প্রথা। আর নতুন বন্ধুতা স্থাপন করতে হয় অগ্নি সাক্ষী করে। বিবাহে বরকন্যা যেমন অগ্নি প্রদক্ষিণ করে, তেমনি করে দুই নূতন বন্ধুকেও অগ্নি প্রদক্ষিণ করতে হয়।

আমার ভারি আশ্চর্য বোধ হল এই সামাজিক রীতির কথা শুনে। মিত্রতা বন্ধন ও বিবাহ বন্ধনে সেদিন কোন প্রভেদ ছিল না। বিবাহ বন্ধনের প্রথা এখনও আছে, উঠে গেছে মিত্রতা বন্ধনের প্রথা।

গুরুজী বললেনঃ দুই বন্ধুতে পাশাপাশি বসে যে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা আছে। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সীতাকে দেখতে পেয়েছিলেন সুগ্রীবেরা। সীতা তাঁর উত্তরীয় ও কিছু অলঙ্কার নিচে ফেলে দিয়েছিলেন। সুগ্রীব তা কুড়িয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। সেগুলি দেখাতেই রাম শোকে যেন ভেঙে পড়লেন। তাই দেখে সুগ্রীব বললেন, শোকে তুমি অধীর হোয়ো না। আমার স্ত্রীকেও বালী অধিকার করেছে, কিন্তু আমি অশিক্ষিত হয়েও বিচার বুদ্ধি হারাই নি। শোকাচ্ছন্ন লোকের সুখ থাকে না, তেজ ক্ষয় হয়, প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। এই বিপদে তুমি তোমার পৌরুষকে আশ্রয় কর।

এ কথা কোন অশিক্ষিত বানরের কথা নয়, নিজেকে অশিক্ষিত বলে সুগ্রীব নিজের বৈদগ্ধ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন। বালীর শক্তির কথা জানতেন সুগ্রীব, তাই এত দিন নির্বাসনে দিন যাপন করছিলেন। এইবারে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের অঙ্গীকার করলেন।

কিন্তু রামের শক্তির পরীক্ষা নিয়েছিলেন সুগ্রীব। বলেছিলেন, আমার দুর্বৃত্ত ভ্রাতার বলবিক্রম আমি জানি, তুমিও যে অমিতবল তাতে আমার সন্দেহ নেই। রাম এই কথা শুনে নিজের শক্তির পরীক্ষা দিয়েছিলেন, আর তাই দেখে বিস্ময়াবিষ্ট সুগ্রীব ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বলেছিলেন, প্রভু, শুধু বালী নয়, ইন্দ্রাদি দেবতাকেও তুমি বধ করতে সক্ষম। তোমাকে বন্ধু রূপে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

গুরুজী বললেনঃ আমার মনে হয়েছে যে সুগ্রীব একটি কথা রামের কাছে প্রকাশ করেন নি এবং তা গোপন করে থাকলে প্রয়োজন বোধেই তা করেছেন।

তাউজী কৌতূহলী হয়ে বললেনঃ কোন্ কথা ?

গুরুজী বললেনঃ বালীর সঙ্গে রাবণের সম্বন্ধের কথা। সে গল্প তোমাদের মনে নেই ?

অসুরের কথায় গুরুজী আমাদের সে গল্প বলেছিলেন। তবু আমাদের কৌতূহল ছিল। তা লক্ষ্য করে গুরুজী বললেনঃ বালী রাবণকে কী ভাবে জব্দ করেছিলেন তা জানতে পারলে রাম হয়তো বালী বধে দ্বিধা করতেন। কিংবা বালীর সঙ্গে রামের পরিচয় হলে রামায়ণের ঘটনা বোধহয় অন্য রকম হত। বালীর আদেশে রাবণ সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হতেন।

তাউজী বললেনঃ বালী-রাবণের সম্বন্ধের কথাটি আপনি সংক্ষেপে বলুন।

গুরুজী বললেনঃ দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে রাবণ সদর্পে কিষ্কিন্ধ্যায় এসেছিলেন বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বালী তখন চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা বন্দনা করছিলেন। তাঁর অমাত্যরা বললেন, এই যে অস্থিরাশি দেখছেন, এ আপনারই মতো যুদ্ধার্থীর। এখানে অপেক্ষা করুন, আপনারও এই দশা হবে। আর মরবার জন্য বেশী ব্যস্ত হয়ে থাকলে দক্ষিণ সমুদ্রে চলে যান।

রাবণ অপেক্ষা করবেন না, তাই তাঁর পুষ্পক রথে চড়ে দক্ষিণ সমুদ্রে এসে উপস্থিত হলেন। সমুদ্র তীরে বালী তখন সন্ধ্যা বন্দনারত।

হিমগিরির মতো তাঁর দেহ, বালার্ক সদৃশ মুখ। রাবণ তাঁকে ধরবার জন্য রথ থেকে নেমে নিঃশব্দে অগ্রসর হলেন। বালী তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও নিঃশব্দে নিশ্চল হয়ে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। তারপর পদশব্দে রাবণ নিকটস্থ হয়েছেন বুঝেই তাঁকে কক্ষে ধারণ করে আকাশে উঠলেন। মুক্ত হবার জন্য রাবণ অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তাঁর আমত্যরা হায় হায় করে উঠল।

বালী একে একে উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে সন্ধ্যা বন্দনা শেষ করে রাবণকে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরলেন। সেখানকার উপবনে রাবণকে নামিয়ে সহাস্যে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরাজিত রাবণ তাঁর পরিচয় জানাতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না, বললেন, আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, তোমার বলবীর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। তুমি আমাকে পশুর মতো চতুঃসমুদ্রের জল খাইয়েছ।

তারপরেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করলেন বালীর কাছে, বললেন, অগ্নি সাক্ষী করে আমি তোমার সঙ্গে চিরস্থায়ী সখ্য স্থাপন করতে চাই। আমাদের যা আছে, তা আমাদেরই থাক।

বালী এতে আপত্তি করেন নি। তাঁর বন্ধু হয়ে রাবণ এক মাস কাটিয়ে ছিলেন কিষ্কিন্ধ্যায়, তার পরে লঙ্কায় ফিরে গিয়েছিলেন।

তাউজী বললেনঃ আশ্চর্য ক্ষমতা।

গুরুজী বললেনঃ সুগ্রীব রামকে বলেছিলেন যে বালী প্রতি দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে দক্ষিণ থেকে উত্তর সমুদ্রে ও পশ্চিম থেকে পূর্ব সমুদ্রে অনায়াসে যাতায়াত করেন। পর্বতে আরোহণ করে তিনি তার শিখরগুলি বলের মতো লোফালুফি করেন। এক সঙ্গে সপ্ত শাল বৃক্ষকে নিষ্পত্র করেন। এ শুধু বালীর বলবীর্যের কথা নয়, এর মধ্যে আর একটি পরম সত্য নিহিত আছে। ধার্মিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন বালী। প্রতি দিন চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা বন্দনার জন্য তাঁকে অক্লান্ত কায়িক ক্লেশ স্বীকার করতে হত। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে রাবণ পুষ্পক রথে চেপে দক্ষিণ সমুদ্রে গিয়েছিলেন। এ স্থান যদি কন্যাকুমারী হয় তো পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র তিনি কাছাকাছি পেতেন। কিন্তু উত্তর

সমুদ্র কাকে বলা হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। সে যেখানেই হোক, কিষ্কিন্ধ্যা থেকে প্রতি দিন দক্ষিণ সমুদ্রে যাওয়ার কথাও এ যুগে ভাবা যায় না। অথচ বালীর বিমান ছিল না। ধর্ম কাজের জন্য তাঁকে প্রতি দিন এই অসাধ্য সাধন করতে হত।

এই বালীকে বধ করার ভার নিলেন রাম। সুগ্রীবকে বললেন, তুমি এগিয়ে গিয়ে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর, আমি অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে তাকে বধ করব।

কিন্তু রাম তাঁর কথা রাখতে পারলেন না। সুগ্রীবের গর্জন শুনে বালী বেরিয়ে এসেছিলেন, তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল দুই ভাইএর। তাঁদের আকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মতো অভিন্ন ছিল বলে কে বালী আর কে সুগ্রীব রাম তা বুঝতে পারলেন না। কাজেই বালীকে তিনি বধ করতে পারলেন না। সুগ্রীব পরাজিত হয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

রামের উপরে অভিমান হয়েছিল সুগ্রীবের। কিন্তু রাম তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে পর দিন আবার যুদ্ধে পাঠালেন। সেদিন তাঁর গলায় অভিজ্ঞান স্বরূপ গজপুষ্পীলতার মালা বেঁধে দিলেন। আবার কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে সুগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

সুগ্রীবের গর্জন শুনে বালী বেরিয়ে আসছিলেন, কিন্তু তারা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, এমন ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি যুদ্ধে যেও না। একদিন অপেক্ষা কর। কাল সুগ্রীব পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল, আজ নিশ্চয়ই নিঃসহায় হয়ে আসে নি। কুমার অঙ্গদ চরের মুখে রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ পেয়েছে। তারা ধর্মজ্ঞ, তাদের সঙ্গে বিরোধ অকর্তব্য। আর সুগ্রীব তো তোমার ভাই, তোমার স্নেহের পাত্র, তার মতো বন্ধুও তোমার কেউ নেই। তাকে আবার ফিরিয়ে এনে যুবরাজ কর।

তারার কথা বালী শুনলেন না, বললেন, রামকে আমি ভয় করি না, পাপ কর্ম তিনি কখনই করবেন না। আর সুগ্রীবের কথা! তার গর্জন আমি সইব না। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, তাকে আমি প্রাণে মারব না, শুধু তার দর্প চূর্ণ করে ফিরে আসব।

কিন্তু বালী আর ফিরতে পারেন নি। দুই ভাইএ হাতাহাতি হচ্ছিল. নখ জানু পদ ও বাহু দিয়ে তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করছিলেন, গাছ ও শিলা ব্যবহার করে রক্তাক্ত হচ্ছিলেন। তারপর হীনবল হয়ে সুগ্রীব যখন বার বার রামের দিকে তাকাতে লাগলেন, তখন নেপথ্যে থেকে রাম তাঁর সংকল্প রক্ষা করলেন। একটি বাণের আঘাতে বালীকে ভূপাতিত করলেন।

মৃত্যুর পূর্বে বালী রামকে ভৎর্সনা করেছিলেন। বলেছিলেন, তোমার রাজোচিত আভিজাত্য ও ধর্মপরায়ণতার কথা আমি শুনেছিলাম। তাই তারার নিষেধ না শুনে সুগ্রীবের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নেমেছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে অন্যের সঙ্গে আমি যখন যুদ্ধরত সেই অসতর্ক অবস্থায় তুমি আমাকে আঘাত করবে না। কিন্তু এখন দেখতে পেলাম যে তুমি ভণ্ড, তুমি অধার্মিক, সাধুর বেশে তুমি পাপাচারী। আমি জানি না, সাধুর সমাজে এখন তুমি মুখ দেখাবে কেমন করে!

বালী থামলেন না, বললেন, কেন তুমি আমাকে লুকিয়ে থেকে বধ করেছ তা জানি। সম্মুখ যুদ্ধে তোমার সাহস ছিল না। কিন্তু একবার যদি আমাকে বলতে তাহলে এক দিনেই আমি সীতাকে উদ্ধার করে দিতাম। দুরাত্মা রাবণের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে তোমার পায়ের কাছে ধরে এনে দিতাম।

কিন্তু বালীর ভৎর্সনা রাম মেনে নিলেন না, বললেন, তুমি ধর্ম অর্থ কাম ও লোকাচার না জেনে আমার নিন্দা করছ। সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে তুমি পুত্রবধূ স্থানীয় ভাতৃবধূকে ভ্রাতার জীবিতাবস্থাতেই অধিকার করেছ। পাপীকে বধ করে আমি রাজধর্ম পালন করেছি। রাম আরও বললেন, তুমি শাখামৃগ, মৃগয়ায় প্রচ্ছন্নে থেকে মৃগ বধে যেমন দোষ নেই, তেমনি তোমাকে বধ করাও আমার অন্যায় হয় নি।

বালী এই কথা মেনে নিয়েছিলেন। তারপরে উপদেশ দিয়েছিলেন অঙ্গদ ও সুগ্রীবকে। কাউকে কোন দোষ তিনি দেন নি, ক্ষমা করেছিলেন সবাইকে। রামের কাছেও ক্ষমা চেয়েছিলেন তাঁর রূঢ়

ভাষণের জন্য। সুগ্রীবকে বলেছিলেন, তুমি আজই এই রাজ্যের ভার নাও। আর অঙ্গদকে বলেছিলেন, তুমি সুগ্রীবের বশে চলবে, তাঁর শত্রুদের সংসর্গে থাকবে না। তাঁর সঙ্গে অপ্রণয় বা অতিপ্রণয় কোনটাই করবে না।

তারা বিলাপ করতে লাগলেন, আর বালী বীরের মতো পরলোকে চলে গেলেন। বৈদিক প্রথায় তাঁর শেষকৃত্য হল। বানরেরা এক বৃহৎ শিবিকায় বালীর সুসজ্জিত দেহ নিয়ে গিয়ে নদী তীরে চিতার উপরে স্থাপন করল। রোদনরত অঙ্গদ সুগ্রীবের সাহায্যে পিতার মুখাগ্নি করে চিতা প্রদক্ষিণ করল। তারপর সমবেত সকলেই তর্পণ করে বালীর প্রেতকার্য সম্পন্ন করল।

গুরুজী বললেনঃ বানরদেব আর একটি প্রথা আমাদের জানা হল। মৃত্যুর পরে তাদের মানুষের মতো সৎকার হত।

মৃত্যুর কথায় আমার একটি নূতন কথা মনে পড়ল। এত দিন আমরা দেবযোনির কথা শুনেছি, তাদের মৃত্যুর কথা শুনি নি। বানর দেবযোনি নয় বলেই বোধহয় তারা অমর নয়। কিন্তু হনুমান তো অমর!



গুরুজী বললেনঃ বালীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তারা অঙ্গদকে নিয়ে রণক্ষেত্রে চলে এসেছিলেন। বালীকে আলিঙ্গন করে তাঁর করুণ বিলাপ রামায়ণের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। হনুমান যখন

তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন যে এই বানর রাজ্য বীর বানরগণ ও অঙ্গদ এ সমস্তই তোমার রইল, তখন তারা বলেছিলেন যে অঙ্গদের মতো শতপুত্রও আমার কাম্য নয়, মৃত পতির সঙ্গে সহমরণই আমার শ্রেয়। বালী তারাকে কোন উত্তর দেন নি, উপদেশ দিয়েছিলেন সুগ্রীবকে। বলেছিলেন, সাধ্বী তারার ইষ্ট ও অনিষ্ট নির্ণয়ের বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম, এঁর উপদেশ তুমি অসংশয়ে মেনে নিও।

গুরুজী বললেন: বালীর এই কথাতেই বোঝা যাচ্ছে যে সেকালের সহমরণ প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল না। তারা তাই সহমরণের কথা মনে করেছিলেন, কিন্তু কার্যত তা করেন নি। সুগ্রীবের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন।

স্থির হয়েছিল যে বর্ষার চার মাস রাম এইখানে কাটাবেন, তারপরে যুদ্ধযাত্রা করবেন। কিন্তু শরৎ আসবার পরেও যখন সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের কোন ব্যবস্থা করলেন না, তখন হনুমান সুগ্রীবকে তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করে দিয়ে চারি দিক থেকে বানরদের ডেকে আনবার ব্যবস্থা করলেন। আর রাম ব্যস্ত হয়ে লক্ষ্মণকে পাঠালেন কিষ্কিন্ধ্যার রাজপুরীতে। রাজধানীর পথে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে ভীত বানরেরা সুখনিদ্রামগ্ন সুগ্রীবকে জাগালেন। হনুমান সুগ্রীবকে বলেছিলেন এগিয়ে যেতে, লক্ষ্মণকে প্রণাম করে প্রসন্ন করবার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সুগ্রীব অঙ্গদকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে অন্তঃপুরে আনবার জন্য। ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ নিকটস্থ হয়ে কাঞ্চী ও নূপুর নিক্বণ শুনে শুধু লজ্জিত নয় ক্রুদ্ধও হলেন, ধনুর জ্যা আকর্ষণ করে এক টংকার দিলেন। ভয় পেলেন সুগ্রীব, কিন্তু তবু নিজে এগোলেন না। পত্নী রুমাকে নিয়ে তাঁর সোনার আসনে প্রমদা বেষ্টিত হয়ে রইলেন এবং তারাকে বললেন, তুমি এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণকে প্রসন্ন কর।

গুরুজী বললেন: এখানে তারার এক অভিনব রূপ দেখি আমরা। সুরাপানে মত্ত তারা মদবিহ্বলা ও নির্লজ্জা, স্খলিত গমনে গেলেন লক্ষ্মণের কাছে। কিন্তু যা বললেন, তা সবই যুক্তিপূর্ণ কথা। বললেন, হে রাজকুমার, কেউ তো তোমার আদেশ অমান্য করেন নি,

তবে তুমি রাগ করছ কেন?

লক্ষ্মণ বললেন, তোমার ভর্তা সুগ্রীবের সংকল্প রক্ষার কোন আগ্রহ আমরা দেখছি না। বর্ষা বিগত হয়েছে, তবু তিনি ভোগ বিলাসে কালক্ষয় করছেন।

তারা বললেন, ক্রোধের এ সময় নয় কুমার। স্বজনের উপরে রাগ করতে নেই, আর সুগ্রীব তো তোমার ভাই। কামনার বশে নির্লজ্জ হয়ে তিনি আমার সঙ্গে কালক্ষয় করছেন সত্য, কিন্তু তুমি এই কাম তত্ত্ব বোঝ না বলেই রাগ করছ। সুগ্রীবকে তুমি ক্ষমা কর।

লক্ষ্মণ এতক্ষণ অবনত মস্তকে তারার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাই তারা বললেন, আমি পরদার হলেও আমার দিকে তাকালে কোন দোষ হবে না, তোমার চরিত্র তুমি নির্মল রেখেছ। এস আমার সঙ্গে।

বলে লক্ষ্মণকে তিনি সুগ্রীবের কাছে নিয়ে এলেন।

গুরুজী থামলেন কিছুক্ষণের জন্য, তারপরে বললেন: সুগ্রীবের চরিত্রে আমরা বালীর মতো ধর্মনিষ্ঠা ও শক্তির পরিচয় পাই নে। তাই বলে ভীরু তিনি ছিলেন না। লঙ্কায় রাবণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাক্ষস সেনাপতিরা কে কোথায় থাকবেন তার সংবাদ বিভীষণ চর পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। রাম বলেছিলেন যে তিনি নিজে আক্রমণ করবেন দশানন রাবণকে। কিন্তু পরদিন প্রভাতে এক গোপুর শীর্ষে রাবণকে দেখতে পেয়ে সুগ্রীব আর স্থির থাকতে পারলেন না, উত্তেজিত হয়ে তিনিই রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণের পরিধানে ছিল স্বর্ণময় বসন, আর নীল মেঘের মতো অঙ্গের উপরে রক্তের মতো লোহিত উত্তরীয়, মাথার উপরে বিজয় ছত্র ও পাশে শ্বেত চামর। সুগ্রীব তাঁর উপরে লাফিয়ে পড়ে রাবণের মাথার মুকুট নিলেন কেড়ে। বললেন, আমি সুগ্রীব, আমার হাতে আজ তোমার নিস্তার নেই।

রাবণ এগিয়ে এসে বললেন, এতদিন সুগ্রীব ছিলে, আজ হবে হীন-গ্রীব। তোমার গ্রীবা আজ আমি ছিঁড়ে ফেলব।

তারপরে দুজনের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হল। মুষ্টি প্রহার ও যুযুৎসুর

কৌশল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করবার পরে রাবণ বুঝতে পারলেন যে মায়াবান প্রয়োগ না করে আর উপায় নেই। আর রাবণের এই মতলব বুঝতে পেরে সুগ্রীব আকাশে উঠলেন ও রাবণকে বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত করে রামের কাছে ফিরে এলেন।

কিন্তু রাম সুগ্রীবের এই দুঃসাহসিকতার প্রশংসা করেন নি। বলেছিলেন, তুমি রাজার অনুপযুক্ত কাজ করেছ।

সুগ্রীব বলেছিলেন, রাঘব, আমি আমার শক্তি জানি। তাই শত্রু দেখে স্থির থাকতে পারি নি।

গুরুজী বললেনঃ লঙ্কার যুদ্ধ রাক্ষস সেনার সঙ্গে বানর সেনার যুদ্ধ। রাম নিয়ম করেছিলেন যে বানরেরা মানুষের রূপ ধারণ করবে না। মানুষ রূপে যুদ্ধ করবে শুধু সাতজন—রাম লক্ষ্মণ বিভীষণ ও তাঁর চার অমাত্য। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এই বিরাট বানর বাহিনী এসেছে। নল নীল গজ গবয় গবাক্ষ ঋষভ গন্ধমাদন সুষেণ বেগদর্শী ও জাম্ববান, হনুমান ও অঙ্গদের কাঁধে চেপে রাম লক্ষ্মণ এসেছিলেন। এঁরা তাঁদের বাহন। এঁরাই মন্ত্রী ও সেনাপতি। বিভীষণ যখন রাবণকে পরিত্যাগ করে রামের কাছে এলেন, তখন সুগ্রীব তাঁকে বিশ্বাস করেন নি। রামকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে চার অমাত্যের সঙ্গে বিভীষণকে বধ করা উচিত।

বানররাই রামের মন্ত্রী, তাই রাম তাঁদের উপদেশ চাইলেন। কিন্তু বানরেরা বুদ্ধিমান মন্ত্রীর মতো বলল, আমাদের সম্মান দেবার জন্য যে তুমি আমাদের মত চাইছ, তা আমরা বুঝি।

অঙ্গদ বললেন, দোষ গুণের কথা না জেনে বিভীষণকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।

শরভ বললেন, চর পাঠিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করা দরকার।

জাম্ববান বললেন, বিভীষণ আমাদের শত্রুর কাছ থেকে এসেছেন বলে শঙ্কার পাত্র।

মৈন্দ বললেন, মিষ্টালাপ করে বিভীষণের অভিসন্ধি জানা দরকার।

কিন্তু হনুমান এঁদের কথা সমর্থন করলেন না, যুক্তি দিয়ে বললেন যে বিভীষণের ভাব ভঙ্গি সন্দেহজনক নয় বলে তাঁকে দলে নেওয়াই উচিত।

সুগ্রীব প্রতিবাদ করে বললেন, বিপদের সময় ভাইকে যে পরিত্যাগ করে তাকে পরিহার করাই উচিত। সে রাবণের চর, আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়ে সে আমাদের সর্বনাশ করবে।

কিন্তু রাম হনুমানের কথাই মেনে নিয়েছিলেন। আর বিভীষণকে দলে নেবার পরে কোন বানর আর তাঁকে অবিশ্বাস করে নি।

রাবণের কাছ থেকে দূত এসেছিল সুগ্রীবকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য, কিন্তু সুগ্রীব তাকে বলেছিলেন যে লঙ্কাপুরী ভস্ম করে ফিরব। আর অঙ্গদ এই দূতকে গুপ্তচর মনে করে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। বানরেরা তার লাঞ্ছনার সীমা রাখে নি, রামের দয়াতেই সে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পেরেছিল।

অনেকক্ষণ আমরা কেউ কথা বলি নি। এবারে তাউজী বললেনঃ আপনি সমুদ্রের উপরে সেতুবন্ধনের কথা বলেন নি।

গুরুজী হাসলেন, বললেনঃ সেতুবন্ধনের কথা বলতে হলে নলের কথা বলতে হয়। নল ছিলেন বানরদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বিশ্বকর্মার পুত্র বলে পরিচিত। কিন্তু বানর হয়েছিলেন কেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু এই নল বড় বিনয়ী ছিলেন, নিজের গুণের কথা কাউকে বলেন নি। সমুদ্র পার হবার প্রয়োজন যখন হয়েছিল, তখন রাম সমুদ্রের সাহায্য না পেয়ে সমুদ্রকে শুষ্ক করবার আয়োজন করেছিলেন। ভয় পেয়ে সমুদ্র দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে বিশ্বকর্মার পুত্র নল তাঁর দলে আছেন, তিনি সেতু নির্মাণে সক্ষম। শত যোজন দীর্ঘ ও দশ যোজন বিস্তৃত সেতু নল মাত্র পাঁচ দিনে সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই কাজে বানররাই তাঁকে সাহায্য করেছিল। কেউ সূত্র ধরল, কেউ মাপদণ্ড ধরল, আর বাকি সবাই গাছ ও পাথর বয়ে আনল। এত অল্প সময়ে এত বড় সেতু এ কালের ইঞ্জিনিয়াররা কি তৈরি করতে পারবেন!

গুরুজী এইবারে বললেন : হনুমানের কথা না বললে বানরের কথা সম্পূর্ণ হবে না। হনুমান ছিলেন পবননন্দন। আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস যে রাবণ বধের জন্য দেবতারা নানা ভাবে রামকে সাহায্য করেছেন। ব্রহ্মার কাছে রাবণ অমর হবার বর পান নি, নর ও বানর ব্যতীত আর সকলেরই অবধ্য ছিলেন তিনি। এই জন্যে বিষ্ণু নর জন্ম নিয়েছিলেন, আর দেবতারা এসেছিলেন বানররূপে। বালী ইন্দ্রের পুত্র, সুগ্রীব সূর্যের, আর হনুমান ছিলেন পবনের পুত্র। তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত আছে রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেও আছে।

তাউজী বললেন : সংক্ষেপে এই গল্পটি বলুন।

গুরুজী বললেন : রাম অগস্ত্য ঋষিকে বলেছিলেন যে তিনি হনুমানকে বালী ও রাবণের চেয়েও বলশালী বলে মনে করেন। হনুমানের বলবুদ্ধি দক্ষতা ধৈর্য ও নীতি জ্ঞান কারও চেয়ে কম ছিল না। কিন্তু সুগ্রীবকে সাহায্যের জন্য বালীকে কেন বধ করেন নি, তার কোন কারণ খুজে পান নি। এই প্রশ্নের উত্তরেই অগস্ত্য রামকে হনুমানের পূর্ব বৃত্তান্ত বলেছিলেন। শাপের ফলে হনুমান তাঁর শক্তির কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

হনুমানের পিতা কেশরী ছিলেন বানর রাজ, তাঁর রাজ্য ছিল সুমেরু পর্বতে।

গুরুজীর এই কথা শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। একটু আগে তিনি হনুমানকে পবন নন্দন বলেছিলেন। কিন্তু কোন প্রশ্ন আমি করলাম না। দেখতে পেলাম যে অনেকের দৃষ্টিতেই এই প্রশ্ন জ্বলজ্বল করে উঠেছে।

গুরুজী বললেন : কেশরী বিবাহ করেছিলেন শাপভ্রষ্ট অপ্সরা পুঞ্জিকস্থলাকে। ঋষির শাপে তিনি কুঞ্জর বানরের কন্যা অঞ্জনা নামে জন্মেছিলেন। একদিন কেশরী ও অঞ্জনা যখন পাহাড়ের উপরে মানুষ মূর্তিতে ক্রীড়া করছিলেন, তখন অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ পবন তাঁকে আলিঙ্গন করেন, হনুমানের জন্ম হয়েছিল এই মিলনের ফলে। তাইতেই হনুমান পবন নন্দন নামে পরিচিত।

জন্মের পরেই হনুমান তাঁর শক্তির প্রথম পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্ষুধায় তিনি কাঁদছিলেন, মা অঞ্জনা গিয়েছিলেন জল আহরণে। হনুমান দেখলেন যে জবা ফুলের মতো সূর্য উঠছে। সেই বালার্ককে খাবার জন্যে হনুমান এক লাফে আকাশে উঠলেন। সেদিন রাহু আসছিলেন সূর্যকে গ্রাস করবার জন্য, ভয় পেয়ে তিনি ইন্দ্রের কাছে পালিয়ে গেলেন। ইন্দ্র যখন ঐরাবতে চড়ে এলেন, তখন হনুমান ঐরাবতকেই ধরতে গেলেন। ইন্দ্র বজ্রাঘাত করলেন হনুমানকে। হনুমান বিহ্বল হয়ে পাহাড়ের উপরে পড়লেন, তাঁর মুখের হনু ভেঙে গেল।

অচেতন শিশু পুত্রকে নিয়ে পবন এক গুহায় ঢুকলেন। পৃথিবী থেকে বায়ু অন্তর্হিত হয়ে গেল, সকলের কষ্টের আর সীমা রইল না। তখন দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মা এলেন পবনের কাছে। তাঁকে তুষ্ট করবার জন্যে হনুমানকে সঞ্জীবিত করে নানা বর দিলেন দেবতারা। হনু ভাঙার জন্য শিশুর নাম হল হনুমান। সূর্যের কাছে তিনি শাস্ত্র জ্ঞান পেলেন, ব্রহ্মার বরে হলেন কামরূপী অব্যাহত গতি ও অজেয়।

তাউজীর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ কামরূপী মানে যারা ইচ্ছে মতো রূপ ধারণ করতে পারে। রাক্ষসরাও কামরূপী। শৈশবে হনুমান ঋষিদের আশ্রমে উপদ্রব করতেন। ঋষিরা জানতেন যে দেবতাদের শাপে হনুমান প্রবল শক্তির অধিকারী। তাই তাঁরা শাপ দিলেন যে তিনি তাঁর শক্তির কথা দীর্ঘ কাল ভুলে থাকবেন, কেউ তা মনে করিয়ে না দিলে এ কথা তাঁর মনে পড়বে না।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ কখন কে হনুমানকে তাঁর শক্তির কথা মনে করিয়ে দিলেন ?

গুরুজী হেসে বললেনঃ জাম্ববান। সীতার অন্বেষণে বেরিয়ে অঙ্গদ তাঁর বীর বানরবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র কোথাও সুপ্ত, কোথাও ক্রীড়া চঞ্চল, কোথাও বা উত্তাল তরঙ্গ পর্বতের মতো। আকাশের মতো অপার ও বিপদ সঙ্কুল এই সমুদ্র দেখে বানররা বিপদগ্রস্ত হল। কেমন

করে এই সাগর লঙ্ঘন হবে, কে লঙ্ঘন করবে এই সমুদ্র ?

অঙ্গদ বললেন, সমুদ্র আমাদের লঙ্ঘন করতেই হবে, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া আমাদের চলবে না। কে আছ বল, তোমাদের মধ্যে কে সমুদ্র লঙ্ঘন করবে ?

দলপতিরা একে একে নিজেদের লম্ফের পরিমাণ বলল। গয় বলল, দশ যোজন, গবাক্ষ বিশ, শরভ ত্রিশ, ঋষভ চল্লিশ, গন্ধমাদন পঞ্চাশ, মৈন্দ ষাট, দ্বিবিদ সত্তর, সুষেণ আশি, বৃদ্ধ জাম্ববান বললেন, এই বয়সে আমি নব্বুই যোজন পারব। অঙ্গদ বললেন, তাহলে আমিই যাব। শত যোজন সমুদ্র আমি পার হতে পারব, কিন্তু ফিরতে পারব কিনা জানি নে।

কিন্তু আপত্তি করলেন জাম্ববান, বললেন, বৎস, তুমি আমাদের আজ্ঞাদাতা, তুমি ফিরে আসতে সক্ষম হলেও তোমার যাওয়া চলবে না। তারপরে হনুমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কেন নীরবে আছ হনুমান, তোমার শক্তির কথা কি তোমার জানা নেই !

তারপরে জাম্ববান তাঁর জন্ম কথা শোনালেন। বললেন, পবন-নন্দন তুমি, স্বর্গের অপ্সরা তোমার মা। জন্মের পরেই নবোদিত সূর্যকে ধরবার জন্য তুমি তিন শত যোজন আকাশে উঠেছিলে, সে কথা কি আজ ভুলে গেছ ? আজ তোমার বিক্রম প্রদর্শনের দিন এসেছে। আজ এই সমুদ্র লঙ্ঘন করবে তুমি।

হনুমান বুঝি তাঁর পূর্ব স্মৃতি ফিরে পেলেন। তাঁর আকার বাড়তে লাগল, বিশাল হল দেহ। পায়ের নিচের শিলা টলমল করে উঠল। তিনি মহেন্দ্র পর্বতের উপরে গিয়ে উঠলেন। বললেন, লঙ্কায় যদি সীতাকে দেখতে না পাই তো রাবণের সঙ্গে লঙ্কাপুরী আমি তুলে নিয়ে আসব। বলে লাফ দিলেন।

গুরুজী বললেন ঃ হনুমানের বীরত্বের কথা বাল্মীকি একটি সম্পূর্ণ কাণ্ডে বিবৃত করেছেন। সুন্দর কাণ্ডটি হনুমানেরই লঙ্কা অভিযানের কাহিনী, সুন্দর কাণ্ডের নায়ক হলেন হনুমান। সাগর লঙ্ঘন করে হনুমান লঙ্কাপুরী দেখলেন, রাবণের ভবন ও অশোকবন দেখলেন,

সীতার সাক্ষাৎ পেলেন। রাক্ষস সংহারের জন্য তাঁর বন্ধন হল, বিচার হল রাবণের সভায়। তারপর লঙ্কাদাহ করে ফিরে এলেন সীতার বার্তা নিয়ে। রাম স্বীকার করেছেন যে হনুমানের বিক্রমেই এই দুঃসাধ্য সাধন হয়েছে। হনুমানের সহায়তাতেই তিনি রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। বানর রাজ বালীর চেয়ে বা রাক্ষস রাজ রাবণের চেয়ে হনুমান নিকৃষ্ট ছিলেন না। সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ধর্মাত্মা হনুমান রামের প্রিয়তম অনুচর ছিলেন।

রামের অভিষেক উপলক্ষে সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান প্রভৃতি বানরেরা এসেছিলেন অযোধ্যায়। নানা উপহার দিয়ে রাম তাঁদের সকলের সম্মান করেন। নিজের গলার মালা হনুমানের গলায় পরিয়ে দিয়ে রাম বলেছিলেন, তোমার জন্যে প্রাণ দান করলেও তোমার ঋণ আমার শোধ হবে না। বিদায় নেবার সময় হনুমান বলেছিলেন, প্রভু তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও ভক্তি যেন অবিচল থাকে। রাম বলেছিলেন, থাকবে। যত দিন পৃথিবীতে রাম কথা প্রচলিত থাকবে, তত দিন তোমার শরীর ও কীর্তি দুইই থাকবে।

হনুমান অমর হয়ে আছেন রামের বরে। দ্বাপরেও তাঁকে আমরা দেখতে পাই। পবনের অপর পুত্র ভীম দ্রৌপদীর অনুরোধে দিব্য পদ্ম সংগ্রহে হিমালয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষের অগম্য স্বর্গের পথে এসে দেখলেন যে হনুমান সেই পথ রোধ করে অপেক্ষা করছেন। ভীমের অনুরোধে হনুমান পথ ছেড়ে দিলেন না। তাই দেখে ভীম বললেন, হনুমান যেমন করে সাগর লঙ্ঘন করেছেন, তেমনি করে আমিও তোমাকে লঙ্ঘন করতে পারতাম। কিন্তু সকল প্রাণীতে পরমাত্মা আছেন বলে তা করব না। তুমি পথ ছাড়।

হনুমান জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান কে ?

ভীম বললেন, তিনিও পবন নন্দন ও আমার অগ্রজ। আমিও তাঁরই মতো শক্তিশালী। পথ ছেড়ে না দিলে আমি তোমাকে যমালয়ে পাঠাব।

হনুমান বললেন, বার্ধক্যের জন্যে আমি অচল হয়ে পড়েছি,

তুমি আমার লেজটা সরিয়ে চলে যাও।

ভীম তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সেই লেজ সরাতে পারলেন না। তখন সবিনয়ে বললেন, আপনি কে বলুন।

হনুমান তখন নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন, রামের বরে আমি বেঁচে আছি, আর সীতার বরে কোন ভোগ্য বস্তুর অভাব আমার নেই।

ভীম বললেন, সমুদ্র লঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল, সেই রূপ একবার দেখতে চাই।

হনুমান সেই রূপ ধারণ করলেন। বিন্ধ্য পর্বতের মতো বিশাল দেহ। বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে ভীম সেই রূপ দর্শন করলেন। তারপরে হনুমান ভীমকে সেই পদ্মবনের সন্ধান দিলেন। বললেন, মহাযুদ্ধে তোমাকে আমি সাহায্য করব।

গুরুজী একটু থেমে বললেন : হনুমানের চরিত্রে আমরা দেবত্ব আরোপ করেছি। কেন করেছি, তা তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে। তিনি ছিলেন নিষ্কাম কর্মের জীবন্ত উদাহরণ, যোগীর আদর্শ। পরম শাস্ত্রজ্ঞ দূরদর্শী, অথচ শিশুর মতো সরল। অমিত বিক্রম, অথচ ধীর স্থির গম্ভীর। পৌরুষ ও বিনয় একই সঙ্গে তাঁর চরিত্রকে মধুর করেছে। তাঁর ভক্তিতে আড়ম্বর ছিল না, সেবায় উচ্ছ্বাস ছিল না, অনুরাগে আবেগ ছিল না। অথচ ভক্তি সেবা ও অনুরাগে সকলের চিত্ত জয় করেছিলেন। তাঁর মনে কামনা ছিল না, বিলাসের বাসনা ছিল না, ভোগের লোভ তাঁর চিত্তকে কখনও অশান্ত করে নি। বৈরাগী মন ছিল হনুমানের, তপস্যা তাঁর সেবায়, ভক্তি দিয়ে তিনি দেবত্ব লাভ করেছিলেন।

তাউজী বললেন : আমাদের দেশে যে হনুমানের পূজা প্রচলিত হয়েছে, তা কি শাস্ত্র সম্মত ?

গুরুজী বললেন : প্রাচীন পুরাণে ও তন্ত্র শাস্ত্রে হনুমানের পূজার বিধি দেখতে পাওয়া যায়। হনুমান চিরজীবী বলে জন্ম তিথি প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সপ্ত চিরজীবীর মধ্যে হনুমানেরও পূজা করা হয়। শোনা যায় যে অর্জুন হনুমৎ সাধন করে পৃথিবী জয়ের ক্ষমতা অর্জন

করেছিলেন। হনুমৎ কল্প একটি তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তাঁর ধ্যান আছে অন্যান্য দেবতার মতো।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: কিষ্কিন্ধ্যায় গেলে আজও অনেক স্মৃতি চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

তাউজী বললেন: রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কি আজও আছে!

গুরুজী বললেন: আছে বৈকি। অন্ধ্র রাজ্যের বেলারি জেলায় আছে হস্পেট নামে একটি স্টেশন। সেখান থেকেই কিষ্কিন্ধ্যা দেখতে হয়। প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হল কতগুলো বড় বড় পাথর একটার উপরে আর একটা এমন করে সাজানো যে মনে হবে পুরাকালে বানরেরা এই সব পাথর নিয়ে খেলা করত। তারাই এ সব অদ্ভুত ভাবে সাজিয়েছিল। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এই কিষ্কিন্ধ্যা। পম্পা সরোবর, অঞ্জনা পাহাড়, মতঙ্গমুনির আশ্রম সবই দেখতে পাওয়া যায়। আর দেখা যায় প্রাচীন বিজয় নগরের ধ্বংসাবশেষ।

গুরুজীর কথায় আমার মন চলে গেল অনেক দূরে। মনে হল, বুঝি আমি এই ত্রেতা যুগের কিষ্কিন্ধ্যাতেই পৌঁছে গেছি। ভুল বোঝা-বুঝির জন্যে দুই ভাইএ বিবাদ বেধেছে। ছোট ভাই পালিয়ে আছেন বড় ভাইয়ের ভয়ে, কিন্তু কোন অনিষ্টের কথা চিন্তা করছেন না। বড় ভাইও ছোট ভাইকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি বলে নিশ্চিন্ত আছেন। দুই ভাইয়ের এই বিবাদ বোধহয় এক দিন মিটে যেত। বড় ভাইয়ের রাগ পড়লেই ডেকে আনতেন ছোট ভাইকে, কিংবা ছোট ভাইই আবার যেতেন ক্ষমা চাইতে। কিন্তু তা হল না। মাঝখানে মানুষ আসতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। মানুষের চক্রান্তে প্রাণ দিতে হল একজনকে। সে মানুষ দু ভাইয়ের বিবাদ মিটিয়ে না দিয়ে অন্যায় ভাবে হত্যা করলেন বড় ভাইকে। মানুষের এই বিধান তারা মেনে নিল। বলল, আমরা অশিক্ষিত অসভ্য জাত। তোমরা সভ্য মানুষে যা করেছ তাই বোধহয় ঠিক। বানরকে মানুষ সভ্য করতে চেয়েছিল, তাই বানরের সভ্যতা আজ লোপ পেয়েছে।



গুরুজী বললেন ঃ উপদেবতার কথায় বানরের কথা এসে পড়েছিল। কিন্তু বানরকে উপদেবতা বলা চলে না। যে সমস্ত গুণের অধিকারী হলে দেবযোনি বলা হয়, সে সমস্ত গুণ সাধারণ বানরের মধ্যে নেই। বানর জাতিকে মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। রামায়ণে যে বানর সমাজ দেখা যায়, সে সমাজ যে অনেক উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সমুন্নত সমাজ কেমন করে বন্য হয়ে গেল, তা আমাদের জানা নেই। রামায়ণের সভ্যতাকে অস্বীকার করার যুক্তি নেই, আবার আজকের অবস্থা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। কাজেই এই দুই অবস্থার মধ্যে একটা সঙ্গতি দেখাবার চেষ্টা করতে হলে বলতে হয় যে রামায়ণোক্ত বানর সমাজ লোপ পেয়েছে, কিংবা এ যুগের কোন অঞ্চলের মানুষই সে যুগে বানর নামে অভিহিত হত। যেমন নাগ বা গন্ধর্ব।

বলে গুরুজী থামলেন।

নাগের কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু গন্ধর্বের কথা গুরুজী এখনও আমাদের বলেন নি। গন্ধর্বরা ভাল গায়ক ছিল বলে শুনেছি। দেবতাদের জয় হলে গন্ধর্বরা গান গাইত, আর নৃত্য করত অপ্সরা। অপ্সরার কথাও গুরুজী আমাদের বলেন নি।

তাউজী বললেন ঃ গন্ধর্বদের কি আপনি মানুষ বলেন ?

গুরুজী হেসে বললেন ঃ আমি বলি না, বলেন অন্য লোকে।

সাধারণ ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে এ কালের কান্দাহার ছিল পুরাকালের গান্ধার। ভরতের মামাবাড়ি ছিল গান্ধারে, গান্ধারী ছিলেন গান্ধার রাজকন্যা। ভরতের স্ত্রী মাণ্ডবীর সঙ্গে গান্ধারীর সম্পর্ক খুঁজে বার করা কষ্টকর নয়। কিন্তু গান্ধার দেশের মানুষকে গন্ধর্ব বলত কিনা তার উল্লেখ নেই। বরং হিমালয়ে গন্ধর্ব জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অসম্ভব নয় যে গন্ধর্ব নামে কোন জাতি হিমালয়ে বাস করত। এ সমস্ত গবেষণার বিষয়, কিন্তু তার জন্যে উৎসাহীর অভাব। ইতিহাসের ছাত্ররা নানা রকমের গবেষণা করছে। প্রাচীন সাহিত্যের ছাত্ররাও যে করছে না, তা নয়। তার প্রধান কারণ এই যে বাস্তব জগতে তার কোন প্রয়োজন বোধ নেই।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: ভারত এখন সকল ধর্মের দেশ বলে হিন্দু ধর্মের কোন কথা স্কুল কলেজে পাঠ্য নয়। শৈশব থেকে আমরা তাই ছড়া ও রূপকথা পড়ি, তার পর গল্প ও রোমাঞ্চ কাহিনী। বেদ উপনিষদ পুরাণ কাকে বলে, আমাদের দেশের খুব কম ছেলেমেয়ে তা জানে। আধুনিক বাপমায়েরাও মানেন না যে এ সব গ্রন্থে নিজেদের বা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কিছু জানবার কথা আছে। বরং ভাবেন যে ঐ প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক শিক্ষা বিকাশের অন্তরায় হবে।

তাউজী বাধা দিয়ে বললেন: দোষ আমাদেরও আছে। পুরাণকে আমরা অনাদর করেছি চিরকাল। সাধারণ মানুষের উপযোগী করে আজও আমরা পুরাণ রচনা করি নি। তার প্রচারেরও কোন ব্যবস্থা নেই।

তাউজীর এ কথা আমি নিঃশব্দে মেনে নিলাম। আমি কোন ভাল লাইব্রেরিতেও সমস্ত পুরাণ এক সঙ্গে দেখি নি। যে দুএকখানা অনুবাদ দেখেছি, তা আধুনিক যুগোপযোগী নয়। সংস্কৃত শ্লোক ও সেকেলে বাঙলায় আক্ষরিক অনুবাদ। রামায়ণ মহাভারতের মতো সারানুবাদ নেই, কিংবা সরল ভাষায় সংক্ষেপে সেই গল্প লেখা হয় নি। একেবারে নেই বলা উচিত হবে না। দু একখানি পুরাণের পদ্যে অনুবাদ দেখেছি। সে সব অর্ধশিক্ষিত মানুষের জন্য প্রকাশিত

হয়েছে, অশ্লীলতাও স্থান পেয়েছে তাতে। যে দু একখানি বই শিশুদের জন্য দেখেছি, তা সুলিখিত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার প্রচার খুব সীমাবদ্ধ। সরকার অগ্রণী হয়ে স্কুলে কলেজে অবশ্যপাঠ্য না করলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবে না।

গুরুজী বললেনঃ তোমরা সে ভার গ্রহণ করলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না।

এর পরে গুরুজী আমাদের গন্ধর্বের কথা বললেন।—

গন্ধর্বরা স্বর্গের গায়ক, শুধু গান বাজনা নয়, তাঁরা নাট্যাভিনয়েও পটু। অতি রূপবান তাঁরা, স্বর্গেও তাঁদের রূপের খ্যাতি সুবিদিত। তাঁদের আমরা ইন্দ্রের সভায় দেখি, দেখি ব্রহ্মার সভায়। অন্যান্য দেবতাদের সভাতেও তাঁদের আমরা গান বাজনা শোনাতে দেখি। কিন্তু তাঁরা স্বর্গবাসী নন। তাঁদের বাসস্থান গন্ধর্বলোক। নিচে গুহ্যকলোক, বিদ্যাধরলোক উপরে। মাঝখানের গন্ধর্বলোক থেকে তাঁরা স্বর্গে যাতায়াত করেন। পৃথিবীতেও আমরা তাঁদের দেখতে পাই।

গন্ধর্বদের মধ্যেও আবার দুটি জাতি আছে। গন্ধর্বলোকের যাঁরা পুরনো অধিবাসী তাঁদের বলে দিব্য গন্ধর্ব, আর যে মানুষেরা পুণ্যবলে গন্ধর্ব হন তাঁরা মর্ত্য গন্ধর্ব নামে পরিচিত।

ঋগ্বেদেও আমরা দৈব গন্ধর্বের উল্লেখ দেখি। বৈদিক যুগে তাঁরা উঁচু শ্রেণীর উপদেবতা বলে গণ্য হতেন, আর বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন দেবতাদের। তাঁরা সোমরস তৈরি করতে জানতেন এবং তা রক্ষা করতেন। ওষধির ব্যবহার জানতেন বলে তাঁদের বৈদ্যও বলা হত। তাঁরা অশ্বচালনা জানতেন, সূর্যের অশ্ব চালাতেন তাঁরা। কিন্তু এ সব গুণের জন্য যত তার চেয়ে বেশি প্রিয় ছিলেন তাঁরা সঙ্গীতজ্ঞ বলে। গন্ধর্বরা ছিলেন একটি সঙ্গীতপ্রিয় জাতি, তাঁদের বাদ দিয়ে দেবতাদের কোন উৎসব সম্ভব ছিল না।

গন্ধর্বদের উৎপত্তি কথা আছে বিষ্ণুপুরাণে। ব্রহ্মার কান্তি থেকে

গন্ধর্বরা উৎপন্ন হয়েছেন। গো মানে গান বা বাক্য, আর ধমন মানে উচ্চারণ। গান করতে জন্ম বলে এঁদের গন্ধর্ব নাম হয়েছে। মহাভারতের মতে তাঁরা কশ্যপের পুত্র। দক্ষকন্যা মুনি ও প্রধা তাঁদের মা। হরিবংশের মতে তাঁদের মা হলেন অরিষ্টা। মুনির ষোলটি ও প্রধার দশটি পুত্র হয়ে ছিল। তাঁরা মৌনেয় গন্ধর্ব ও প্রাধেয় গন্ধর্ব নামে পরিচিত। জটাধর যে গন্ধর্ব বংশের পরিচয় লিখেছেন. তাতে আমরা আটজন প্রধান গন্ধর্বের নাম পাই। তাঁরা হলেন হাহা হূহূ হংস বিশ্বাবসু চিত্ররথ নন্দী সোমায়ু ও তুম্বুরু। গন্ধর্ব নগরে এঁদের চেয়ে গণ্যমান্য আর কেউ ছিলেন না।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: গন্ধর্ব নগর কি গন্ধর্বলোকে?

গুরুজী বললেন: গন্ধর্বলোকের এই নগর খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। বড় বড় প্রাসাদে বাস করতেন এই সব বিখ্যাত গন্ধর্বরা।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: আর একটি বিষয়ে গন্ধর্বরা খুবই আধুনিক ছিলেন। পুরুষ ও নারী অবাধে মেলামেশা করতেন। পরস্পরের সম্মতি হলেই হত বিবাহ। এই বিবাহের নাম গন্ধর্ব বিবাহ। গন্ধর্বরা যে শুধু পুরুষ হতেন এমন নয়, এঁদের মধ্যে স্ত্রীজাতিও ছিল, তাঁদের বলা হত গন্ধর্বী। আবার অপ্সরাদেরও দেখা যেত গন্ধর্বদের স্ত্রী রূপে। অপ্সরাদের মধ্যে পুরুষ ছিল না বলে তারা গন্ধর্বদের সঙ্গিনী রূপেও বসবাস করত। গান বাজনার আসরে গন্ধর্ব ও অপ্সরাকে দেখা যেত এক সঙ্গে। স্বর্গীয় নাটকে এরা এক সঙ্গে অভিনয় করতেন।

তাউজী বললেন: এঁরা তাহলে খুবই আধুনিক ছিলেন বলতে হবে।

গুরুজী এই কথা শুনে তাউজীর মুখের দিকে তাকালেন। তাউজী বললেন: আমাদের দেশের মেয়েরা কি খুব বেশি দিন আগে অভিনয়ে নেমেছে!

গুরুজী হেসে বললেন: ঠিক কথা। সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই এঁদের আমরা নৃত্য গীত ও অভিনয় করতে দেখি। স্বচ্ছন্দে এঁরা আকাশে বিচরণ করতেন এবং এক সঙ্গে বেড়াতে এঁদের কোন দ্বিধা

হত না। কিন্তু একটা দুর্বলতা ছিল গন্ধর্বদের। সুন্দরী নারীর প্রতি এঁদের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। স্বর্গের অপ্সরাকে ফেলে পৃথিবীতে নেমে আসতেন মাঝে মাঝে। দেখা হত, ভাব হত, পরস্পরের সম্মতিতে হত বিবাহ। রাক্ষসের মতো তাঁরা নারীকে হরণ করতেন না, প্রেমিকের মতো জয় করতেন নারীকে। দুষ্মন্ত যেমন শকুন্তলাকে জয় করেছিলেন, তেমনি মিলনের নামই গন্ধর্ব বিবাহ।

গুরুজী একটু থেমে বললেন ঃ ঋগ্বেদে একটি অদ্ভুত কথা আছে। সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদে উত্তরঃ তৃতীয়োঽগ্নিষ্টোপতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ। প্রথমে চন্দ্র তারপরে গন্ধর্ব ও তারও পরে অগ্নি উপভোগ করেন নারীকে, তারপরে মানুষ সেই নারীকে বিবাহ করে পায় ভোগের অধিকার। গন্ধর্বরা দেহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিশেষ। আকাশে চন্দ্র দেহে গন্ধর্ব ও পৃথিবীতে অগ্নি। কুমারী কন্যার যৌবনের উন্মেষ তো এঁরাই প্রথমে দেখেন।

সংস্কৃত শ্লোকটি তাউজী টুকে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর অর্থ জেনে সে চেষ্টায় বিরত হলেন।

গুরুজী বললেন ঃ এই গন্ধর্বদের সম্পর্ক যে দেবতাদের সঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। অন্যান্য সমাজেও তা সহজে বিস্তৃত হত। গন্ধর্ব রাজ শৈলুষের কন্যা সরমা ছিলেন রাক্ষস বিভীষণের স্ত্রী। আর একজন গন্ধর্ব কন্যা দুন্দুভীর মানব জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার শাপে, তিনি রামায়ণের মন্থরা। মদালসা গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসুর কন্যা, তিনি রাজকুমার ঋতধ্বজকে বিবাহ করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এ গল্প আমি তোমাদের পরে বলব।

তাউজী বললেন ঃ একবার আপনি গন্ধর্ব রাজের নাম বললেন শৈলুষ, আর একবার বললেন বিশ্বাবসু। এঁরা দুজনেই কি এক সঙ্গে গন্ধর্ব রাজ ছিলেন, না তাঁদের কাল ভিন্ন ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গুরুজী বললেন ঃ পুরাণে এই রাজা শব্দটির ব্যবহার খুব সংযত নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কাউকে সম্মান দিতে হলেই তাকে রাজা বলা হয়েছে। বাবু শ্রীযুক্ত মহাশয়

প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দ প্রচলিত না থাকার জন্যেই বোধহয় এই রকম হত। তাই প্রধান নাগদের বলা হত নাগরাজ, তেমনি বানর রাজ ভল্লুক রাজ রাক্ষস রাজ গন্ধর্ব রাজ। শক্তিশালী ক্ষত্রিয় মানেই রাজা। এঁরা ছোট ছোট দলের সর্দার বা জমিদার ছিলেন, না সত্যিই বড় বড় রাজ্য শাসন করতেন তা জানবার উপায় নেই। তবে মনে হয় যে ছোট বড় দলপতিদেরই এই সম্মান দেওয়া হত। একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন দেবরাজ। দেবতাদের একজনই রাজা, তাঁর নাম ইন্দ্র। সেই ইন্দ্র যখন প্রাণের ভয়ে সমুদ্রের ভিতর আত্মগোপন করে আছেন, তখনও কোন দেবতা দেবরাজের শূন্য সিংহাসনে বসতে নারাজ। পৃথিবী থেকে রাজা নহুষকে স্বর্গের সিংহাসনে বসবার জন্যে মনোনীত করা হয়েছিল।

দেবতার কথায় এই গল্প আমরা শুনেছি। কিন্তু তখন এই গল্প খুব আশ্চর্যের মনে হয় নি। এবারে মনে হল। কোন দেবতা কেন দেবরাজ হয়ে সিংহাসনে বসতে রাজী হলেন না! অসুরদের ভয়ে, না ইন্দ্রের প্রতি আনুগত্যে! কিন্তু স্বর্গের সিংহাসন যে শূন্য থাকা উচিত নয়, সে কথা তো তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন! তা না হলে নহুষকে কেন নির্বাচন করে এনে তাঁর অভিষেক করবেন! এর পরের কথাও আমার মনে পড়ল। নহুষ যখন সগর্বে ইন্দ্রাণী শচীকে অধিকার করতে চাইলেন, দেবতারা তখন কেন নিরস্ত হয়ে বসে রইলেন! নহুষকে শাসন করবার ক্ষমতা কি কারও ছিল না, না সেও দেবরাজের প্রতি তাঁদের আনুগত্য! ঋষি অগস্ত্যের শাপে নহুষের পতন না হলে ইন্দ্রাণী শচী হতেন নহুষের মহিষী! কী লজ্জার কথা!

গুরুজী বললেনঃ যেমন অপ্সরাদের তেমনি গন্ধর্বদের বয়স আমরা অনুমান করতে পারি না। এক একজন গন্ধর্ব এক এক সময় রাজত্ব করেছেন, তা বলা অসঙ্গত হবে। তার চেয়ে মনে করা ভাল যে ছোট বড় দলপতিদেরই গন্ধর্ব রাজ বলা হত। তাঁদের এক একটি বংশ ছিল, অনেক অনুচর নিয়ে তাঁরা বের হতেন এবং খুব সম্মানের পাত্র ছিলেন তাঁরা।

গুরুজী বললেন : মহাভারতে আমরা যক্ষরাজ কুবেরের সভার বিস্তৃত বিবরণ পাই দেবর্ষি নারদের কাছে। সেখানে আমরা অসংখ্য গন্ধর্ব ও অপ্সরার নাম, কিন্নর ও বিদ্যাধরের নাম, যক্ষেরও নাম পাই। কিন্তু তাদের কীর্তি কলাপ সম্বন্ধে কিছু জানতে পাই নে। নানা পুরাণ থেকে মাত্র জনকয়েক গন্ধর্ব সম্বন্ধে কিছু কাহিনী সংগ্রহ করতে পারা যায়। তার থেকেই আমরা গন্ধর্বদের প্রকৃতি ও আচার-বিচারের একটা ধারণা করতে সক্ষম হই।

তাউজী বললেন : এই কাহিনীগুলি আমাদের বলবেন না?

তাউজীর প্রশ্ন শুনে গুরুজী একবার বাহিরের দিকে তাকালেন। রাতের অন্ধকার থমথম করছে। ঘৃতের প্রদীপে শুধু অল্প একটু স্থান আলোকিত হয়ে আছে, ধূপ নিবে গেছে, ধুনার গন্ধও ফুরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে গুরুজী বললেন : সে সব গল্প কাল বলব।

বলে উঠে পড়লেন।



পরদিন গুরুজী বললেন : মানুষের সঙ্গে গন্ধর্ব ও অপ্সরারা কী ভাবে মেলামেশা করতেন, তার কিছু আভাস পাওয়া যায় মহাভারতে। আদি পর্বে আমরা রুরু ও প্রমদ্বরার যে কাহিনী পাই, তার আলোচনাতেই একটা স্পষ্ট ধারণা হবে। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন বিবাহ করেছিলেন শর্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যাকে। এঁদের পুত্রের নাম প্রমতি। অপ্সরা ঘৃতাচীর সঙ্গে প্রমতির মিলনের কথা জানা

যায় না, কিন্তু এই মিলনের ফলে এক পুত্র হয়েছিল প্রমতির। তারই নাম রুরু।

এ দিকে গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর সঙ্গেও অপ্সরা মেনকার মিলনের ফলে এক কন্যার জন্ম হয়। মহাভারতকার মেনকাকে নির্দয়া নির্লজ্জা অপ্সরা বলে অভিহিত করেছেন। এই নবজাত শিশুকে তিনি নির্জনে নদী তীরে পরিত্যাগ করে চলে যান। মহর্ষি স্থূলকেশীর আশ্রম ছিল নিকটে। তিনি এই শিশুকে দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে এনে তাকে লালন করেন। বড় হলে ঋষি তার নাম রাখেন প্রমদ্বরা। রূপে ও গুণে সকল প্রমদার শ্রেষ্ঠ হয়েছিল এই কন্যা।

শকুন্তলার কথা আমার মনে পড়ল। সেও মেনকার কন্যা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তার পিতা। শকুন্তলাকেও মেনকা পরিত্যাগ করেছিলেন, আর মহর্ষি কণ্ব পালন করেছিলেন শকুন্তলাকে।

গুরুজী বললেন: রুরুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল প্রমদ্বরার। দুজনেরই মা অপ্সরা, কিন্তু রুরুর পিতা ব্রাহ্মণ ও প্রমদ্বরার পিতা গন্ধর্ব।

সহসা আমার মনে হল যে গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসু বাস করতেন পৃথিবীতে। মেনকার সঙ্গেও তাঁর মিলন হয়েছিল পৃথিবীতে। তাই স্বর্গের অপ্সরা তাঁর কন্যাকে পৃথিবীর এক নদী তীরে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, আর একজন ঋষি এই শিশুকে তাঁর আশ্রমে প্রতিপালন করেছিলেন। বিশ্বাবসুকে আমরা গন্ধর্বলোকের বাসিন্দা বললে এই কথাই মানতে হবে যে অপ্সরা মেনকা সেই গন্ধর্বলোক ছেড়ে পৃথিবীতে নেমেছিলেন কন্যার জন্ম দিতে। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

ভাউজী বললেন: রুরু ও প্রমদ্বরার গল্প বলবেন না?

গুরুজী বললেন: গন্ধর্বের কথায় তাদের প্রয়োজন নেই।

তারপরেই বললেন: না, আছে প্রয়োজন। ওই গল্পে বিশ্বাবসুর কথা আবার এসে পড়বে।

তারপরে রুরু ও প্রমদ্বরার পরিণয় কথা শোনালেন আমাদের।

একদিন মহর্ষি স্থূলকেশীর আশ্রমে অপরূপ লাবণ্যময়ী প্রমদ্বরাকে দেখে রুরু মোহিত হল। এক বয়স্যকে দিয়ে তার মনের কথা জানাল

পিতা প্রমতিকে। প্রমতি স্থূলকেশীর কাছে নিজের পুত্রের জন্য তাঁর পালিতা কন্যাটিকে প্রার্থনা করলেন। রাজী হলেন স্থূলকেশী। বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল।

কিন্তু তার আগেই প্রমদ্‌বরার মৃত্যু হল সর্পাঘাতে। একটি সুপ্ত সর্পের গায়ে পা পড়তেই সর্পটি তাকে দংশন করেছিল। সবাই এসে দেখলেন যে বিষে প্রমদ্‌বরা বিবর্ণ হয়ে গেছে। দেহে তার প্রাণ নেই। ঋষিরা কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু শোকার্ত রুরু চলে গেল গহন বনে। বিলাপ করে বলল, আমার ব্রত ধর্ম তপস্যায় যদি ফল হয়ে থাকে তো সেই পুণ্যে আমার প্রিয়া জীবিত হয়ে উঠুক।

দেবতারা এই বিলাপ শুনে এক দেবদূত পাঠালেন। দেবদূত বললেন, বৃথা কেন বিলাপ করছ! এই কন্যার আয়ু শেষ হয়েছিল বলেই এমন হয়েছে। তবে কেউ যদি তার নিজের আয়ুর অর্ধেক তাকে দান করে, তবে সে জীবন ফিরে পেতে পারে।

তখনি রুরু বলল, আমি দেব আমার আয়ুর অর্ধেক।

প্রমদ্‌বরার জনক গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসু সেই দেবদূতের সঙ্গে গেলেন যমরাজের কাছে। রুরুর অর্ধেক আয়ুর বিনিময়ে কন্যার জীবন ফিরে পেলেন। প্রমদ্‌বরার যেন নিদ্রা ভঙ্গ হল. এমনি ভাবে সে জেগে উঠল। তারপরে তাদের বিবাহ হল।

বিশ্বাবসুর কথায় আর একটি প্রশ্ন এল আমার মনে। বিশ্বাবসু তাহলে নিজের কন্যাকে চিনতেন। কিন্তু তবে কেন তিনি এই কন্যাকে ঋষির আশ্রমে ফেলে রেখেছিলেন? নির্দয়া মেনকা তাঁর কন্যাকে ফেলে যেতে পারেন, বিশ্বাবসু তো তাকে কুড়িয়ে আনতে পারতেন।

এ অভিযোগ সত্য নাও হতে পারে। মেনকা তাঁর কন্যাকে কোথায় পরিত্যাগ করেছেন, এ কথা বিশ্বাবসুর অজ্ঞাত হতে পারে। যখন জানলেন তিনি এই কন্যার কথা, তখন হয়তো তাকে পালন করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কন্যার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি ছুটে এসেছিলেন, যমের কাছে গিয়েছিলেন তার প্রাণ ভিক্ষার জন্যে। মেনকার মতো নির্দয় তাঁকে বলা চলে না।

তার পরে গুরুজী একটু ভেবে বললেন : ঋগ্বেদেও আমরা এই বিশ্বাবসুর উল্লেখ দেখি। দেবলোকবাসী দেবতা রূপেই তিনি পূজিত। অন্যত্র তাঁকে জলের সৃষ্টিকর্তা রূপে দেখি।

তাউজী আশ্চর্য হয়ে বললেন : ঋগ্বেদে কি তাঁকে গন্ধর্ব বলা হয় নি ?

গুরুজী বললেন : ঋগ্বেদে গন্ধর্বের উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশ্বাবসুর স্তুতি শুনে তাঁকে দেবতা বলেই মনে হয়। ইনি স্বর্গের অধিবাসী, গন্ধর্বলোক বা পৃথিবীর মানুষ নন। মহাভারতে আমরা যে বিশ্বাবসুকে দেখি, তাঁকে দেবতা বলতে পারি নে। তাঁকে গন্ধর্ব বা মানুষ বলেই মনে হয়। রাজা পুরূরবার প্রাসাদ থেকে তিনি স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে উদ্ধার করেছিলেন কৌশলে। স্বর্গের গন্ধর্বরা বিশ্বাবসুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সে গল্প বলব উর্বশীর প্রসঙ্গে।

আমি ভেবেছিলাম যে তাউজী বোধহয় এখনই এই গল্প শুনতে চাইবেন। কিন্তু তা চাইলেন না। শান্ত ছেলের মতো নিঃশব্দে গুরুজার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

গুরুজী বললেন : এই বিশ্বাবসুর দুটি পুত্র কন্যার কথা আমরা জানি। পুত্রের নাম চিত্রসেন, আর মদালসা তাঁর কন্যার নাম।

তাউজী বললেন : মদালসা নামটি বড় পরিচিত মনে হচ্ছে।

গুরুজী বললেন : মদালসার দীর্ঘ কাহিনী আছে মার্কণ্ডের পুরাণে।

তাউজী বললেন : এই কাহিনীটি আপনি এখনি বলুন।

গুরুজী হেসে বললেন : তার আগে চিত্রসেনের কথা সংক্ষেপে বলি।

সংক্ষেপে কেন ?

উর্বশীর প্রসঙ্গে এই চিত্রসেনের কথাও আসবে। আর একটু কষ্ট স্বীকার করলে এঁদের কালের সম্বন্ধেও একটা ধারণা হবে।

কী রকম ?

পুরূরবার প্রাসাদ থেকে বিশ্বাবসু উর্বশীকে উদ্ধার করেছিলেন

বলেছি। আর অর্জুন যখন অমরাবতীতে ইন্দ্রের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করছেন, তখন এই চিত্রসেন তাঁকে নৃত্যগীতও শিখিয়েছিলেন। পুরূরবা চন্দ্রবংশের রাজা, অর্জুনেরও জন্ম এই বংশে। চন্দ্র ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রির পুত্র। গুরুপত্নী তারাকে তিনি হরণ করেছিলেন, বুধ তাঁদের পুত্র এবং পুরূরবা পৌত্র। এই পুরূরবার সঙ্গে উর্বশী দীর্ঘ দিন সংসার করেছিলেন, চন্দ্রবংশের জননী তিনি। অর্জুন জন্মেছেন কত পুরুষ পরে তার হিসাব করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মোটামুটি ভাবে ধরা যেতে পারে যে চব্বিশ পঁচিশ পুরুষ পরে অর্জুনের জন্ম। তার মানে বর্তমান কালের হিসাবে আটশো বছর পরে।

আমরা আশ্চর্য হলাম এই কথা শুনে যে উর্বশী পুরূরবার সঙ্গে সংসার করেছিলেন এবং আটশো বছর পরে তিনি অর্জুনের কাছে গিয়েছিলেন অভিসারে!

গুরুজী বললেন: এই ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে যে অপ্সরা ও গন্ধর্বদের আয়ু কত বেশি ছিল। বিশ্বাবসু পুরূরবার সমসাময়িক, আর তাঁর পুত্র চিত্রসেন হলেন অর্জুনের সমসাময়িক। এই আটশো বছরের মধ্যে মানুষের চব্বিশটি পুরুষ গত হয়েছে।

আশ্চর্য!

বলে তাউজী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

গুরুজী বললেন: এই জন্যেই আমি বার বার বলি যে পুরাণ নিয়ে আমাদের গবেষণা করার প্রয়োজন আছে। প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বাদ দিয়ে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করলে আমরা হয়তো প্রাচীন ভারতের একটা ইতিহাস রচনায় সক্ষম হব। শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজের রূপ নির্ণয়ে যে সক্ষম হব তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ খুব কঠিন কাজও নয়। আধুনিক ঐতিহাসিকের মন নিয়ে রামায়ণ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণ একবার পড়তে হবে। তার বেশি আর কিছু পড়ার দরকার হয়তো হবে না।

তাউজী বললেন: বেদ উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ?

গুরুজী বললেন: সেগুলিও গবেষণার সহায়ক হবে। তবে বেদ

অধ্যয়ন করে তাকে কাজে লাগানো খুব কঠিন ব্যাপার। শুধু ঋগ্বেদেই কিছু পৌরাণিক কাহিনীর উৎস আছে।

তাউজী বললেনঃ এবারে তাহলে চিত্রসেনের কথা বলুন।

গুরুজী বললেনঃ বিশ্বাবসুর মতো চিত্রসেনের কাহিনীও আমরা মহাভারতে পেয়েছি। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় সভাসদ ছিলেন তিনি এবং স্বর্গে নৃত্যগীতের নায়ক বা অধ্যক্ষ ছিলেন। বনবাসী অর্জুন তপস্যার প্রভাবে গিয়েছিলেন ইন্দ্রলোকে, স্বর্গ থেকে ইন্দ্র তাঁর রথ পাঠিয়েছিলেন অর্জুনকে পৃথিবী থেকে আনবার জন্য। ইন্দ্রের কাছে অর্জুন দিব্যাস্ত্র পেয়েছিলেন, আর চিত্রসেনের কাছে শিখেছিলেন নৃত্যগীত। এই চিত্রসেনের কথাতেই উর্বশী অর্জুনের কাছে গিয়েছিলেন অভিসারে। সে কথা পরে বলব।

তাউজী বললেনঃ পরে কেন?

গুরুজী বললেনঃ উর্বশীর কথায় সে কথা ভাল লাগবে।

তারপরে গুরুজী চিত্রসেনের আর একটি গল্প বললেন। এটিও মহাভারতের গল্প। বনবাসী পাণ্ডবেরা তখন দ্বৈত বনে সরোবরের নিকট বাস করছিলেন। কর্ণ ও শকুনি দুর্যোধনকে এক পরামর্শ দিলেন। বললেন, রাজা, তোমরা একবার বনবাসী পাণ্ডবদের দেখতে যাও। শত্রুর দুর্দশা দেখার মতো সুখ আর নেই। ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝানো হল যে ঘোষ যাত্রার প্রয়োজন আছে, গোপ পল্লীর গরু গণনা ও বাছুর চিহ্নিত করতে হবে। কাজেই কৌরবেরা সপরিবারে বিশাল সেনাবাহিনী ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু নিয়ে যাত্রা করলেন।

দ্বৈত বনের নিকটে এসে দুর্যোধন গৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁদের আগেই গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন এসে বাস করছিলেন। তিনি এসেছিলেন কুবের ভবন থেকে। তাঁর অনুচর গন্ধর্বরা দুর্যোধনের লোকদের বাধা দিল। দু দলে বিবাদ বাধল। সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন তাঁর সেনাদল পাঠালেন, কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে এল। তখন বড় বড় যোদ্ধারা এলেন গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। গন্ধর্বদের কথা

না শুনে তারা দ্বৈত বনে প্রবেশ করতেই চিত্রসেন তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, এই অনার্যদের তোমরা শাসন করে এস। গন্ধর্ব যোদ্ধারা এসে কুরু সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে দিল। খবর পেয়ে কর্ণ এলেন এগিয়ে, তাঁর সঙ্গে দুর্যোধন। কর্ণের হাতে গন্ধর্বরা মরছে দেখে চিত্রসেন মায়া যুদ্ধ অবলম্বন করলেন। কর্ণের রথ ধ্বংস হল, দুর্যোধনের ভাইএর রথে চড়ে কর্ণ পালিয়ে গেলেন। কুরু সেনাও পালাতে লাগল। কিন্তু সাহসে ভর করে যুদ্ধ করতে গিয়ে দুর্যোধন চিত্রসেনের হাতে বন্দী হলেন। এই সুযোগে গন্ধর্বরা দুঃশাসন ও কুরুকুলের পরিবারবর্গকেও ধরে নিয়ে গেল। সে এক বিশ্রী পরাজয়।

কোথায় পাণ্ডবদের উপহাস করতে কৌরবেরা এসেছিলেন, শেষে তাঁদের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে। ভীম বললেন, উচিত সাজা হয়েছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির বললেন, না, নিষ্ঠুর হবার সময় এখন নয়, কুরুনারীদের তোমরা রক্ষা কর। মিষ্টি কথায় গন্ধর্বরা তাদের মুক্তি না দিলে যুদ্ধে তাদের পরাস্ত কর।

যুধিষ্ঠির যজ্ঞে নিযুক্ত ছিলেন বলে চার ভাই এগিয়ে গেলেন। কিন্তু অর্জুনের কথা গন্ধর্বরা শুনলেন না, বললেন, আমরা শুধু ইন্দ্রের আদেশ মানি। অর্জুন বললেন, তবে এস, যুদ্ধ কর আমাদের সঙ্গে। বলে বাণ বর্ষণে গন্ধর্ব সেনা ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। উপায় না দেখে চিত্রসেন এলেন গদা হাতে, অর্জুনের বাণে গদা দ্বিখণ্ডিত হল। চিত্রসেন তখন মায়া যুদ্ধ শুরু করলেন। আর অর্জুন শব্দভেদী বাণ যোজনা করলেন তাঁর গাণ্ডীবে। প্রাণ রক্ষার জন্য চিত্রসেন সামনে এসে বললেন, আমাকে চিনতে পারছ না সখা?

অর্জুন তাঁর বাণ সংবরণ করে বললেন, কেন চিনব না! এইতো সেদিন তোমার কাছেই শিখলাম সঙ্গীত। কিন্তু বীর, তুমি কেন কুরু নারীদের হরণ করতে এসেছ?

চিত্রসেন বললেন, তুমি জান না এদের উদ্দেশ্য। এরা তোমাদের উপহাস করতে এসেছিল। তাই দেবরাজ আমাকে বললেন, যাও, সবাইকে বেঁধে নিয়ে এস।

তারপরে দুজনে এলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে। তাঁর অনুরোধে চিত্রসেন বন্দীদের মুক্তি দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন : বৎস, তোমরা বলবান হয়েও কাউকে বধ কর নি ও কুলের মর্যাদা হানি কর নি বলে তোমাদের প্রশংসা করছি।

আকাশ থেকে ইন্দ্র অমৃত বর্ষণ করে মৃত গন্ধর্বদের বাঁচিয়ে দিলেন। আর চিত্রসেন বিদায় নিলেন পাণ্ডবদের কাছে।

তাউজী বললেন : এই ঘটনা থেকে তো আমরা আরও একটি সত্য জানতে পারছি।

গুরুজী বললেন : কী?

গন্ধর্বরা প্রবল যোদ্ধা ছিলেন। শুধু সঙ্গীতে নয়, যুদ্ধেও তাঁরা নিপুণ ছিলেন।

গুরুজী বললেন : তাতে আর সন্দেহ নেই। কর্ণের মতো বীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন আত্মরক্ষায়। এমন ঘটনা তাঁর জীবনে বোধহয় আর কখনও ঘটে নি।

তাউজী বললেন : গন্ধর্বরা ভাল যোদ্ধা না হলে ইন্দ্র তাদের পাঠাতেন না।

ভারি আশ্চর্য বোধ হল আমার। গন্ধর্বরা সুপুরুষ ও সঙ্গীতপ্রিয় বলেই আমি জানতাম। অপ্সরাদের সঙ্গে আকাশে উড়ে যাবার চিত্র আমি দেখেছি। কিন্তু তাদের গদা হাতে যুদ্ধের কথা আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই জাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা সহসা বদলে গেল। আমি আরও কৌতূহলী হলাম গন্ধর্বদের সম্বন্ধে।



গুরুজী বললেন : চিত্ররথ নামে আর একজন গন্ধর্বের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল। এই গল্প আছে মহাভারতের আদি পর্বে। পাণ্ডবেরা পদব্রজে চলেছেন পাঞ্চাল রাজ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। তাঁরা যখন গঙ্গার তীরে এসে পৌঁছলেন, তখন অন্ধকার হয়েছে। এক খণ্ড জ্বলন্ত কাঠ মশালের মতো নিয়ে অর্জুন চলেছেন সকলের আগে। গন্ধর্ব রাজ চিত্ররথ তখন তাঁর স্ত্রীদের নিয়ে গঙ্গায় জলক্রীড়া করতে এসেছেন। মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি বললেন, দিনের আলোয় পৃথিবী মানুষের, এখন এই অন্ধকার পৃথিবী যক্ষ গন্ধর্ব ও রাক্ষসদের। এখন তোমরা জলের কাছে এস না।

অর্জুন বললেন, হিমালয়ে সমুদ্রে ও গঙ্গা তীরে কোন বাধা নেই। কেন তুমি গঙ্গাজল স্পর্শে আমাকে বাধা দেবে?

ক্রুদ্ধ হয়ে চিত্ররথ কয়েকটি শর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু অর্জুন তা নিবারণ করে তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। চিত্ররথের বিচিত্র রথ দগ্ধ হয়ে গেল, তিনি অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন।

এই দৃশ্য দেখে চিত্ররথের স্ত্রী কুম্ভিনসী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রক্ষা করুন আমাদের, স্বামীকে আমার মুক্তি দিন।

যুধিষ্ঠিরের কথায় অর্জুন চিত্ররথকে মুক্তি দিলেন। চিত্ররথ বললেন, আমার বাহন জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো বলে আমার অন্য নাম অঙ্গারপর্ণ। আমি কুবেরের সখা গন্ধর্ব রাজ চিত্ররথ। কিন্তু অর্জুন আজ আমাকে

দগ্ধরথ করেছেন এবং আমার জীবন দান করেছেন বলে আমি তাঁকে চাক্ষুসী বিদ্যা দিচ্ছি। এই বিদ্যার প্রভাবে তিনি ত্রিলোকের সব কিছু দেখতে পাবেন। অন্য সকলকে আমি আমার দেশের একশোটি করে অশ্ব দিচ্ছি। তোমাদের ইচ্ছানুসারে তারা উপস্থিত হবে। অর্জুনের নিকট তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চিরস্থায়ী বন্ধুতা স্থাপন করলেন।

হঠাৎ আমার একটি অদ্ভুত কথা মনে এল। গন্ধর্বলোক বললে আমার অন্তরীক্ষের কোন স্থানের কথা মনে হত। কিন্তু এখন আমার অন্য কথা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে এই গন্ধর্বলোক হিমালয়ের কোন অংশে ছিল। তাই তারা কৈলাসে যেত কুবেরের সভায়। গন্ধর্ব রাজাদের বন্ধুতা ছিল কুবেরের সঙ্গে। আবার সময় মতো ভারত ভূমিতে আসত গঙ্গায় জলক্রীড়ার জন্যে। ইন্দ্রলোকও কোন পৃথিবী ছাড়া দেশ নয়, অনুসন্ধানে তারও সন্ধান মিলবে। ব্রহ্মার সভা তো ছিল সুমেরু পর্বতে। তারই নাম ব্রহ্মলোক। শিবের কৈলাসও আমরা জানি, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ কোথায় ছিল তাও জানা যেতে পারে।

গুরুজী বললেন ঃ অর্জুন তারপরে চিত্ররথকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে আমাদের লাঞ্ছনা করতে চেয়েছিলেন কেন?

চিত্ররথ বললেন, তোমাদের অগ্নিহোত্র নেই, ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রেখে তোমরা চল না বলে তোমাদের এই কথা জানাতে চেয়েছিলাম। বীরত্ব বা আভিজাত্য দিয়ে রাজা রাজ্য জয় করতে পারে না, ব্রাহ্মণকে পুরোভাগে রেখেই চিরকাল রাজ্যপালন সম্ভব। তারপরে তিনি তপতী ও সংবরণের কাহিনী বললেন, বললেন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী। শেষে ধৌম্যকে পুরোহিত নিযুক্ত করবার উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

গুরুজী বললেন ঃ এই চিত্ররথের কাহিনীতে আমরা একটি জিনিস দেখতে পাই। গন্ধর্বরা মানুষকে সৎ পথে চালিত করবার জন্য চেষ্টা করত। চিত্ররথ পাণ্ডবদের একটা মূল্যবান উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে অর্জুনকে বন্ধন করে এই উপদেশ দেবেন।

গায়ে পড়ে উপদেশ দিলে লোকে তার মর্ম বোঝে না। তাইতেই অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হিসাবের ভুল হয়েছিল, তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। কতকটা এই রকম কারণেই চিত্রসেন এসেছিলেন দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে তাঁকে বন্দী করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে শত্রুকে উপহাস করার অধিকার তাঁর নেই।

আশ্চর্য এই গন্ধর্বদের রীতি। ঋষিদের মতো উপদেশ দিতেন না, যুদ্ধে জয় করে সমুচিত শিক্ষা দিতেন।

গুরুজী এবারে কী বলবেন বোধহয় সেই কথা ভাবছিলেন। তাউজী মনে করিয়ে দিলেন তাঁর বলার কথা। বললেন: আপনি বিশ্বাবসুর পুত্র কন্যার কথা বলছিলেন। চিত্রসেনের পরে মদালসার কাহিনী বলবার কথা ছিল।

গুরুজী বললেন: মনে পড়েছে। তার আগে আর একজন গন্ধর্ব-কন্যার কথা সংক্ষেপে বলি। গন্ধর্ব রাজ শৈলুষের কন্যা, সরমা তাঁর নাম। সরমা নাম কেন হল জান?

বলে তাউজীর দিকে তাকালেন।

তাউজী বললেন: জানি নে।

সরমার জন্ম হয়েছিল মানস সরোবরের তীরে। তখন বর্ষাকাল, সরোবরের জল ক্রমশ বাড়ছে। সেই জল যখন সদ্যোজাতা কন্যার নিকটে চলে এল, তখন শৈলুষের স্ত্রী বললেন, সরো মা বর্ধত। হে সরোবর, তুমি আর বর্ধিত হয়ো না। এই থেকেই কন্যার নাম হয়েছিল সরমা।

রাবণ এই সরমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন অনুজ বিভীষণের। তিনিও স্বামীর মতো ধর্মশীলা ছিলেন, প্রচ্ছন্ন ভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারতেন। আকাশে তাঁর অবাধ গতি ছিল। লঙ্কার অশোক বনে বন্দিনী সীতা যখন দুঃখে ভেঙে পড়ছেন, সরমা তখন তাঁকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে সারাক্ষণ রক্ষা করতেন সীতাকে। রামের কুশল সংবাদ দিতেন। অপূর্ব কল্যাণময়ী চরিত্র এই সরমার।

গুরুজী একটুখানি ভাবলেন, তারপরে বললেনঃ আরও একটি গন্ধর্ব কন্যা আছে রামায়ণে। তার নাম মন্থরা, কৈকেয়ীর বাপের বাড়ির দাসী। কুব্জা কূটবুদ্ধি সম্পন্না, কিন্তু কৈকেয়ীর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী সে।

তাউজী বললেনঃ মন্থরার কথা আপনি বলেছেন, এবারে মদালসার কাহিনী বলুন।

সহাস্যে গুরুজী বললেনঃ মদালসার কাহিনী বলতে হলে আগে ঋতধ্বজের কথা বলতে হয়। যুবরাজ ঋতধ্বজ হলেন রাজা শত্রুজিতের পুত্র। পিতার আদেশে তিনি গালব ঋষির আশ্রম রক্ষা করছিলেন। গালব ঋষি যখন সন্ধ্যা বন্দনায় রত তখন এক শূকর রূপী দানব এসে উপস্থিত হল। শিষ্যদের চিৎকারে ঋতধ্বজ তাকে শরবিদ্ধ করলেন, তারপরে তাকে অনুসরণ করে এক গর্তে পতিত হলেন। ঋতধ্বজ শূকরকে আর দেখতে পেলেন না। কিন্তু খুঁজতে খুজতে সেই অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন যে তিনি পাতালে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইন্দ্রপুরীর মতো শত শত প্রাসাদে পূর্ণ সেই পাতালে কোথায় যাবেন তা বুঝতে পারলেন না।

হঠাৎ এক নারীকে দেখতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করে একটি প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। মদালসার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল সেইখানে। মদালসা একটি পালঙ্কে বসেছিলেন, তাঁকে দেখতে পেয়েই অচেতন হলেন। পথে যে নারীকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, সে শুশ্রূষা করতে লাগল মদালসার। এঁদের পরিচয়ও পেলেন তার কাছে। যে পরিচর্যা করছিল, তার নাম কুণ্ডলা, বিন্ধ্যবানের কন্যা ও পুষ্কর মালীর বিধবা পত্নী, মদালসার সখী।

কিন্তু মদালসা এই পাতালে এলেন কী করে ?

কুণ্ডলার কাছেই ঋতধ্বজ এই সংবাদ পেলেন। মদালসা একদিন উদ্যানে বেড়াচ্ছিলেন। বজ্রকেতু দানবের পুত্র পাতালকেতু তাকে দেখতে পেল, আর তারপরেই মায়াবলে তাকে হরণ করে এই পাতালে নিয়ে এল। ঠিক করেছে যে আগামী ত্রয়োদশীর দিন মদালসাকে বিবাহ করবে।

কুণ্ডলা বলল, সখী আমার আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু জানতে পেরেছেন যে দুরাত্মা পাতালকেতু তাঁকে পাবে না। যে মানুষ পৃথিবীতে তাকে শরবিদ্ধ করবেন, তিনিই হবেন মদালসার স্বামী। সখী এখন সেই মানুষের প্রতীক্ষায় আছেন।

তারপরে বলল, আমাদের পরিচয় তো দিলাম, এইবারে আপনার পরিচয় দিন।

নিজের পরিচয় দিলেন রাজকুমার ঋতধ্বজ। এক শূকরকে যে শরবিদ্ধ করেছেন সে কথাও বললেন। তারপরে সেই শূকরের সন্ধানে এখানে এসে এই সব অদ্ভুত কথা শুনতে পাচ্ছেন।

কুণ্ডলা বলল, তাহলে আপনিই বোধহয় পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করেছেন। আপনি বিবাহ করুন আমার সখীকে, তাঁর চোখে আমি অনুরাগ দেখেছি।

গুরুজী বললেন : ঋতধ্বজ কী উত্তর দিয়েছিলেন জান?

গুরুজী কারও কাছে উত্তরের প্রত্যাশা করেন নি। তাউজী তবু বললেন : না।

ঋতধ্বজ বললেন, আমি তো স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। তাঁর আদেশ না পেলে তো আমি বিবাহ করতে পারি নে। কুণ্ডলা তাঁকে বোঝালেন যে গন্ধর্ব বা দেবকন্যাকে বিবাহ করলে কোন দোষ হবে না। ঋতধ্বজ সম্মত হলেন। কুলগুরু তুম্বুরুকে আনা হল। মদালসার সঙ্গে ঋতধ্বজের বিবাহ হল যথা বিধানে।

তুম্বুরু গন্ধর্বের নাম আমি শুনেছি। তিনি একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তিনি কি গন্ধর্বদের কুলগুরু ছিলেন? আমি ভেবেছিলাম যে তাউজী বোধহয় এই কথা জানতে চাইবেন। কিন্তু দেখলাম যে তাঁরা অন্য প্রসঙ্গে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। তাউজী বললেন : দেখা যাচ্ছে যে বিবাহ ব্যাপারে ছেলেরা স্বাধীন ছিল না। পিতা বা গুরুজনের আদেশ বা সম্মতির প্রয়োজন হত।

গুরুজী বললেন : কিন্তু কন্যার পতি নির্বাচনের ক্ষমতা ছিল। প্রকাশ্য স্বয়ম্বর সভায় তাঁরা মনোমত পতি নির্বাচন করতেন। আর

এই মদালসাকেও দেখতে পাই যে ঋতধ্বজকে বিবাহ করলেন পিতার অজ্ঞাতসারে। তিনি একবারও বললেন না যে তিনিও পরাধীন, পিতার অনুমতি নেবার প্রয়োজন তাঁরও আছে।

আমার মনে এল আর একটি কথা। মদালসাকে পাতালকেতু হরণ করে এনে পাতালে রেখেছে। কত দিন আগে এনেছে জানা নেই। কিন্তু আগামী এক তিথিতে বিবাহ করবে। এক কথায় রাজকুমার ঋতধ্বজ এই অপহৃতা কন্যাকে বিবাহ করতে রাজী হয়ে গেলেন। একবারও রামের মতো অগ্নি পরীক্ষার কথা ভাবলেন না। কোন সন্দেহ কোন দ্বিধা এল না মনে, শুচি অশুচির কোন প্রশ্নই তুললেন না। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হল এই যে নরনারীর চারিত্রিক শুচিতা ছিল প্রশ্নের অতীত, দানব পাতালকেতু তাদের বিবাহের দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর দ্বিতীয়টি হল এই যে, অপহৃতা নারীকে তার নিগ্রহের জন্য সমাজে শাস্তির কোন বিধান ছিল না। সেই জন্যেই বোধহয় গুরু বৃহস্পতি তাঁর অপহৃতা স্ত্রী তারাকে গ্রহণ করেছিলেন সহজ ভাবে, বুধের জন্ম নিয়ে কেলেঙ্কারীর পরেও তারার কোন নিন্দা হয় নি। তারাও প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চ কন্যার অন্যতম।

কিন্তু এ নিয়ে ভাবনার আমি সময় পেলাম না। গুরুজী বলতে লাগলেন: মদালসাকে ঘোড়ায় তুলে ঋতধ্বজ যাত্রা করলেন। দানবেরা তাঁকে আক্রমণ করতে এল। যুদ্ধ করলেন ঋতধ্বজ। তাদের পরাজিত করে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। রাজা শত্রুজিৎ তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিলেন।

আমরা ভেবেছিলাম যে মদালসার কাহিনী বুঝি এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তা নয়। গুরুজী বললেন: মদালসার কাহিনীর শেষ হয় নি এইখানে। রাজা শত্রুজিৎ আর একবার ঋতধ্বজকে পাঠালেন পৃথিবী পর্যটন করে ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য। এবারে তিনি যমুনার তীরে এক মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। মুনি তাঁকে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আমার একটি যজ্ঞ

করবার ইচ্ছা, কিন্তু অর্থের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না, দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি তোমার কণ্ঠের হার আমাকে দাও, আর যত দিন ঘুরে না আসি তত দিন আমার আশ্রম রক্ষা কর। ঋতধ্বজ তাঁকে কণ্ঠের হার দিয়ে আশ্রম রক্ষার ভার নিলেন। আর সেই মুনি বরুণের স্তব করবেন বলে জলে প্রবেশ করলেন।

গুরুজী বললেন: আসলে কিন্তু পাতালকেতুর ভাই তালকেতু মুনি সেজেছিল ঋতধ্বজের উপরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। জলের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল রাজা শত্রুজিতের কাছে। ঋতধ্বজের কণ্ঠের হার দেখিয়ে বলল, আমার আশ্রমের কাছেই তিনি তপস্বীদের রক্ষা করছিলেন। দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর প্রাণ গেছে। শূদ্র তাপসেরা তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেছে।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাজা মর্মাহত হলেন, আর প্রাণ ত্যাগ করলেন মদালসা। তালকেতুর প্রতিশোধ নেওয়া সম্পূর্ণ হল। এবারে নিজের আশ্রমে ফিরে গিয়ে ঋতধ্বজকে বলল, তোমার জন্য আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, মঙ্গল হোক তোমার। ঋতধ্বজ তাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে এলেন। তারপরেই শুনলেন সেই মর্মান্তিক কথা। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মদালসা প্রাণত্যাগ করেছেন শুনে পিতার সামনে শোক প্রকাশ করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর শোকের আর সীমা রইল না। ভাবলেন যে স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর সংবাদে প্রাণ ত্যাগ করে তো সেই স্বামীরও স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য প্রাণ দান করা উচিত।

ঋতধ্বজের এই অবস্থার কথা জানল তাঁর দুই বন্ধু। তারা নাগ-রাজ অশ্বতরের দুই পুত্র। একদিন তাদের পিতাকে তারা বলল, বন্ধুর এই অবস্থায় আমাদের উপকার করা কর্তব্য। মদালসাকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই যথার্থ উপকার করা হত, কিন্তু তাতো কোন প্রকারেই সম্ভব নয়, ভগবানও পারেন কিনা সন্দেহ। আমরা কী করতে পারি ভেবে পাচ্ছি না।

ছেলেদের কথা শুনে নাগরাজ বিরক্ত হয়ে বললেন, কোন কাজ

অসাধ্য মনে করে উদ্যমের অভাব হবে কেন! পুরুষকার কখনও বিসর্জন দিতে নেই। তপোবলে দৈব শক্তি লাভ হয়, অসাধ্য সাধন করা যায়। বলে তিনি হিমালয়ের প্লক্ষাবতরণ তীর্থে গিয়ে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।

তাউজী বললেন: আশ্চর্য!

আশ্চর্য কেন!

এই নাগদের কথা আপনি আগে বলেছেন। মানুষ বন্ধুর দুর্ভাগ্যে তারা এমন দুঃখ পায়, আর ছেলেদের ইচ্ছা পূরণের জন্যে বাপ এমন তপস্যা করে!

গুরুজী বললেন: তাইতো দেখতে পাচ্ছি। আর নাগ রাজ তাঁর পুত্রদের যে কথা বললেন, সে হল একটি চিরকালের সত্য কথা। পুরুষকার ও উদ্যমে অসাধ্য সাধন সম্ভব। আর তিনি মুখে যা বলেছিলেন, তা তিনি সত্য বলে প্রমাণ করেছিলেন। শিব ও সরস্বতী এসেছিলেন তাঁকে বর দিতে। তিনি কোন অসম্ভব বর চান নি, তিনি চেয়েছিলেন যে মদালসার নব জন্ম হোক জাতিস্মরা হয়ে। অনুরূপ বয়স ও কান্তি নিয়ে মদালসা তাঁর কন্যা রূপে জন্ম নিক। নাগরাজ এই বর পেয়েছিলেন। মদালসার নূতন জন্ম হল তাঁর কান দিয়ে। এ কথা তিনি কারও কাছে প্রকাশ করলেন না। কন্যাকে নিজের অন্তঃপুরে এনে লুকিয়ে রাখলেন, আর পুত্রদের বললেন তাদের বন্ধু ঋতধ্বজকে নিমন্ত্রণ করে নাগলোকে আনতে।

বন্ধুদের নিমন্ত্রণে ঋতধ্বজ নাগলোকে এলেন। নাগরাজ তাঁকে আদর আপ্যায়ন করে বললেন, ভদ্র, তুমি আমার অতিথি। তোমার কি প্রিয় কাজ করতে পারি বল।

ঋতধ্বজ বললেন, কোন দ্রব্যে তো আমার লোভ নেই।

বলে বন্ধুদের দিকে তাকালেন। বন্ধুরা তাঁর মনের কথা বুঝল, বলল, এঁর স্ত্রী তালকেতু দানবের ছলনায় ভুলে প্রাণ ত্যাগ করেছেন, তাঁকে দেখবার এঁর বড় ইচ্ছা।

নাগরাজ বললেন, মৃত্যুর পরে দর্শন শুধু স্বপ্নে বা আসুরী

মায়ায় সম্ভব।

এই কথা শুনে ঋতধ্বজ সলজ্জায় বললেন, মদালসাকে আপনি মায়া বলেই দেখান।

নাগরাজ বললেন, বেশ, তবে তাই দেখ। বলে অন্তঃপুর থেকে মদালসাকে ডেকে পাঠালেন ও অস্ফুট স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের ভান করলেন। মদালসা এলে বললেন, দেখ তো চেয়ে, ইনি তোমার স্ত্রী কিনা!

ঋতধ্বজ তাঁর দিকে চেয়েই মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভঙ্গের পরে শুনলেন সব কথা। দুজনের পুনর্মিলন হল। পরম আনন্দে দুজনে নাগলোক থেকে ফিরলেন।

গুরুজী বললেনঃ মদালসার কাহিনী সবাই এইখানে শেষ করেন, কিন্তু তাহলে মদালসার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। বেদান্ত ও নীতি শাস্ত্রে মদালসার অগাধ জ্ঞান ছিল। পরিণত বয়সে নিজের পুত্রদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা কোন সর্বজ্ঞ ঋষির পক্ষেই সম্ভব।

রাজা শত্রুজিতের মৃত্যুর পরে ঋতধ্বজ বা কুবলয়াশ্ব সিংহাসনে বসেছিলেন। একে একে তিনটি পুত্র হল মদালসার। ঋতধ্বজ তাদের নাম রাখলেন, আর মদালসা তাদের নিবৃত্তি মার্গের জ্ঞান দিলেন। পুত্রেরা কামনাহীন সংসারবিরাগী হল।

চতুর্থ পুত্রের জন্মের পরে রাজা ঋতধ্বজ বললেন, এবারে তুমি পুত্রের নাম রাখ ও প্রবৃত্তি মার্গের জ্ঞান দাও।

মদালসা তাই করলেন। রাজধর্ম ও গার্হস্থ্য মার্গের জ্ঞান দিলেন এই পুত্রকে। তারপরে এরই উপরে রাজ্যের ভার দিয়ে দুজনে প্রব্রজ্যায় বেরলেন। যাবার সময় পুত্রের হাতে একটি আংটি পরিয়ে দিয়ে বললেন, গৃহীর মমতা একদিন দুঃখে পরিণত হয়। এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠলে এই আংটির ভিতর রক্ষিত আমার শাসন পাঠ কোরো।

এই পুত্র একদিন সেই শাসন বের করে পাঠ করেছিল। তাতে মহর্ষি দত্তাত্রেয়র নিকটে যোগ শিক্ষার উপদেশ ছিল।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মহিলা দার্শনিক ছিলেন গন্ধর্ব কন্যা মদালসা।



আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে গন্ধর্বের কথা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাউজী বললেনঃ আরও অনেক গন্ধর্বের নাম শুনেছি, তাদের কথা কিছু বলবেন না ?

তাউজীর মুখের দিকে তাকালেন গুরুজী।

তাউজী বললেন : হাহা হূহূ—

প্রসন্ন মুখে গুরুজী বললেনঃ এঁরা দুজন সূর্যের গায়ক নামেই বেশি পরিচিত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এঁরা সূর্যের রথে বাস করেন। আসলে এঁরা ইন্দ্রের সভার সঙ্গীতজ্ঞ গন্ধর্ব।

একটু থেমে গুরুজী বললেনঃ তুম্বুরু নামের আর একজন গন্ধর্ব মধুমাস বা চৈত্রমাসে সূর্যের রথে বাস করেন। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এক একজন গন্ধর্ব গায়ক এক এক মাসে সূর্যের কাছে থাকতেন এবং গান শোনাতেন সূর্যকে। সূর্য যে গান শুনতে ভালবাসতেন এই তার প্রমাণ।

তুম্বুরু গন্ধর্বের নাম আমরা দেবর্ষি নারদের কথায় শুনেছি। আর একবার তাঁর কথা শোনবার ইচ্ছা হল, কিন্তু সে ইচ্ছার কথা প্রকাশ করতে পারলাম না!

তাউজী বললেনঃ আপনি যে আটজন শ্রেষ্ঠ গন্ধর্বের নাম করলেন, তাদের সকলের কথা তো বললেন না ?

গুরুজী বললেনঃ যাঁদের কথা জানি, তাঁদের কথাই বলেছি।

হংস সোমায়ু নন্দী পর্বত এদের সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই।

তাহলে তুম্বুরুর সম্বন্ধেই আর একবার বলুন।

গুরুজী হেসে বললেনঃ তুম্বুরুর কাহিনী বুঝি বলেছি আর একবার?

তাউজী বললেনঃ সম্পূর্ণ কাহিনী নয়, একটি মাত্র ঘটনা বলেছেন।

গুরুজী বললেনঃ তুম্বুরুর সম্বন্ধে একটি গল্প আছে অদ্ভুত রামায়ণে।—

ত্রেতা যুগে কৌশিক নামে এক বিষ্ণু ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সারা জীবন তিনি হরিনাম গান করেছেন, আর তার জন্যে তাঁর দুর্দশার সীমা ছিল না। দুঃখ ভোগ শেষ হবার পর কৌশিক এসেছেন বিষ্ণুর সভায়। গণাধিপ হয়েছেন তিনি এবং তাঁর প্রীতির জন্য বিষ্ণুর সভায় মহোৎসবের আয়োজন হয়েছে। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞরাও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। দেবর্ষি নারদও উপস্থিত আছেন। কৌশিক নিজেও হরিগুণ গান করলেন, আর গান গাইলেন তুম্বুরু। তুম্বুরুর গান শুনে দেবর্ষি নারদ রেগে গেলেন। রাগ ঠিক নয়, ঈর্ষা হল তাঁর মনে। গানে তুম্বুরুকে জয় করবার বাসনা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠল। বিষ্ণুর কাছে তিনি উপদেশ চাইলেন। বিষ্ণু বললেন, উলূকেশ্বর গানবন্ধুর কাছে যাও, তিনি তোমাকে গান শেখাবেন।

অধ্যবসায়ের প্রশংসা করতে হয় দেবর্ষি নারদের। গানবন্ধুর কাছে যথানিয়মে দশ হাজার বছর গান শিখলেন। তারপর ভাবলেন যে এখন তুম্বুরুকে জয় করা আর কঠিন নয়। ভাল গান শিখেছেন বলে বেশ অহঙ্কার হয়েছে মনে। তিনি তুম্বুরুর গৃহের দিকে রওনা হলেন।

তুম্বুরুর বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলেন যে কয়েকজন বিকলাঙ্গ স্ত্রীপুরুষ পথের ধারে পড়ে আছে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কে তোমরা?

তারা উত্তর দিল, আমরা রাগ ও রাগিণী।

তোমাদের এ দশা কেন?

নারদ মুনির জন্যে আজ আমাদের এই দশা। তাঁর গানেই আমরা বিকলাঙ্গ হয়েছি।

নারদ লজ্জিত হলেন, দুঃখিতও হলেন, বললেনঃ তা এখানে তোমরা কি করছ ?

তারা বলল : গান গেয়ে তুম্বুরু আমাদের সুস্থ করবেন, এই আশায় এখানে এসেছি।

নারদের অহংকার নিমেষে অন্তর্হিত হল। তিনি মেনে নিলেন যে সঙ্গীত শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হয় নি।

তুম্বুরু গান শিখেছিলেন ব্রহ্মার কাছে, বিষ্ণুর তিনি প্রিয় পার্শ্বচর ছিলেন। আর সূর্যকে গান শোনাতেন চৈত্র মাসে। ইন্দ্র ও কুবেরের সভাতেও গান গাইতেন। এমন গুণীলোক কিন্তু তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন যক্ষরাজ কুবের।

আশ্চর্য হয়ে তাউজী বললেন : কেন ?

গুরুজী বললেন : রম্ভার প্রতি তাঁর আসক্তির জন্য।

কৌতূহলী হয়ে আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

গুরুজী বললেনঃ রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডে এই গল্প আছে। তুম্বুরু নিজের মুখেই বলেছেন যে রম্ভার প্রতি আসক্তির জন্য তাঁর কর্তব্যে ত্রুটি হয়েছিল, সময় মতো তিনি কুবেরের নিকট পৌঁছতে পারেন নি। ক্রুদ্ধ হয়ে কুবের তাঁকে শাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর রাক্ষস জন্ম হবে। অনুতপ্ত হয়েছিলেন তুম্বুরু, অনুনয় করেছিলেন শাপ মুক্তির জন্য। কুবের বলেছিলেন যে রাম তাঁকে বধ করলে তিনি শাপমুক্ত হয়ে নিজ রূপ ফিরে পাবেন ও স্বর্গে তাঁর পুনরায় স্থান হবে।

রম্ভার কথা আমার মনে পড়ল, রাবণের কথায় গুরুজী রম্ভার কথাও বলেছিলেন। কুবেরের পুত্র নলকুবরের কাছে আসতেন রম্ভা। আর সেই রম্ভারই প্রতি আসক্তি ছিল তুম্বুরু গন্ধর্বের। কী ঘটেছিল গুরুজী তা বললেন না, যেটুকু বললেন তাতে মনে হল যে তুম্বুরু সময় মতো আসেন নি কুবেরের কাছে। কুবের ক্রোধী ছিলেন না, আর কাউকে তিনি শাপ দিয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। তাই শুধু দেরিতে আসার জন্যই যে তুম্বুরুকে শাপ দিয়েছিলেন তা মনে হয় না। এর সঙ্গে হয়তো আরও কিছু জড়িত ছিল। নল-কুবরেরও

হাত থাকতে পারে এই শাপের ব্যাপারে।

গুরুজী বললেন ঃ কুবেরের শাপে তুম্বুরুর রাক্ষস জন্ম হল, তাঁর রূপ হল ভয়ঙ্কর। পর্বত চূড়ার মতো প্রকাণ্ড দেহ, বিকট উদর, বিস্তৃত মুখ ও গভীর চোখ। বাঘের ছাল পরা এই বীভৎস নরখাদক রাক্ষসের নাম বিরাধ। দণ্ডকারণ্যে তার বাস।

একদিন বনবাসী রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে এই দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁদের দেখতে পেয়েই বিরাধ ছুটে এলেন যমের মতো। আর সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে বললেন, তপস্বীর বেশে একটি নারী নিয়ে তোমরা দুজনে পাপাচরণ করতে এসেছ! আমি তোমাদের রক্ত পান করব, আর এই নারী আমার স্ত্রী হবে।

ভয়ে সীতা কাঁপতে লাগলেন। রাম অসহায় ভাবে লক্ষ্মণকে বললেন, আমার স্ত্রীর দুর্গতি দেখ, সে এখন রাক্ষসের কোলে। কৈকেয়ীর মনস্কামনা আজ পূর্ণ হয়েছে। নিজের স্ত্রীকে পরপুরুষের কোলে দেখতে হল, এ যন্ত্রণা পিতার মৃত্যু ও রাজত্ব হারানোর চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

লক্ষ্মণ সজল নয়নে বললেন, আপনার শক্তি তো কম নয়, আপনি অনাথের মতো শোক করছেন কেন! আমি এই রাক্ষসকে বধ করব।

বিরাধ হেসে বললেন, ব্রহ্মার বরে অস্ত্রাঘাত করে আমাকে কেউ মারতে পারবে না। তোমরা এই নারীর আশা ত্যাগ করে বিদায় হও।

তাউজী এবারে বাধা দিয়ে বললেন ঃ ব্রহ্মা তাঁকে বর দিলেন কেন?

গুরুজী বললেন ঃ রামায়ণে সে কথা নেই। কোথায় আছে জানি নে।

আমার মনে হল যে রাক্ষসদের এই ধর্ম। প্রথম জীবনে তারা কঠোর তপস্যা করে শক্তি অর্জন করে। বিরাধও বোধহয় তাই করেছিলেন।

তাউজী বললেন ঃ তারপর?

তারপর রাম লক্ষ্মণ দুজনে বিরাধকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাধ হেসে হাই তুলতেই সমস্ত শর তাঁর দেহ থেকে খসে পড়ল।

তারপর সীতাকে নামিয়ে রেখে রাম লক্ষ্মণকে কাঁধে তুলে নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ হে রাক্ষসোত্তম, তোমাকে আমি নমস্কার করছি। রাম লক্ষ্মণকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, বাঘ ভালুক আমাকে খেয়ে ফেলবে। আমাকে নিয়ে তুমি ওদের ছেড়ে দাও।

সীতার এই কথা শুনে রাম লক্ষ্মণ বিরাধের বাহু দুটি ভেঙে ফেললেন। রাক্ষস মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়ল। রাম লক্ষ্মণ তাঁকে মাটি চাপা দিয়ে মারবার ব্যবস্থা করলেন।

বিরাধ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তোমরা যে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা মোহবশে তা বুঝতে পারি নি। আজ আমার শাপ-মুক্তি হল। তোমরা আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দাও, রাক্ষসের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার এই বিধি। তার পরে তোমরা শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে যাও, তোমাদের মঙ্গল হবে।

রাক্ষসের গল্প শেষ করে গুরুজী বললেনঃ তুম্বুরু গন্ধর্বের নাম ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আজও যুক্ত হয়ে আছে।

পরম কৌতূহলে আমরা গুরুজীর মুখের দিকে তাকালাম। তাউজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেমন করে?

গুরুজী বললেনঃ তুম্বুরু বীণার নাম শুনেছ?

উত্তর দিলেন তাউজী, বললেনঃ না।

গুরুজী সহাস্যে বললেনঃ এই বীণাকেই বলে তুম্বুরু বা তানপুরা।

সবিস্ময়ে তাউজী বললেনঃ সত্যি নাকি!

গুরুজী বললেনঃ এই যন্ত্রটি তুম্বুরু গন্ধর্বের সৃষ্টি বলে তুম্বুরু বীণা নামে পরিচিত হয়েছিল। গান ও বাজনার সময় সুর বিরাম ও নিবারণের জন্যে এই যন্ত্রের প্রয়োজন। দুটি লোহার ও দুটি পিতলের তারে সুর বাঁধা হয় এই সুরে—পি নৌ পি স স স প।

আমাদের বিস্ময়েরও যেন শেষ নেই। তা লক্ষ্য করে গুরুজী বললেনঃ এ সব আমার তৈরি কথা নয়, প্রাচীন গ্রন্থ যন্ত্রকোষে এই কথা আছে।

গুরুজী বললেনঃ আর একটি কথা না বললে গন্ধর্বের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শুধু অসম্পূর্ণ নয়। মনে হয় ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর উপাদান আমাদের অজ্ঞাত থাকবে।

নূতন আগ্রহে আমরা সচেতন হয়ে বসলাম।

গুরুজী বললেনঃ অতি প্রাচীন কালে বিবস্বান নামে একজন শক্তিশালী গন্ধর্ব রাজা ছিলেন। পুরাণে তিনি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র, সংজ্ঞা তাঁর স্ত্রী।

তাউজী বলে উঠলেনঃ আপনি কি সূর্যের কথা বলছেন?

সহাস্যে গুরুজী বললেনঃ বিবস্বানেরই দিবি আরোহণ হয়েছিল।

দিবি আরোহণ শব্দটির অর্থ আমরা বুঝতে পারিনি মনে করে বললেনঃ সেকালের নিয়মে অনেক মুনি ঋষি যেমন গ্রহ বা নক্ষত্র হয়েছেন, তেমনি বিবস্বানও সূর্যে পরিণত হয়েছেন। ভারতের পুরা-কাহিনী বুঝতে হলে বিবস্বানকে আগে ঐতিহাসিক পুরুষ বলে প্রমাণ করতে হবে। তিনি সপ্তাশ্ববাহিত রথে বিচরণ করতেন এবং তাঁরই মূর্তি আমরা সূর্যের মন্দিরে দেখি।

বিস্ময়ে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আর গুরুজী উঠে দাঁড়ালেন তারপরেই।

আজকের অধিবেশন শেষ হল এইখানে।



সূর্যোদয়ের পূর্বেই সুপ্তি এসে আমাকে ডাকল, বললঃ এখনও ঘুমচ্ছ তোমরা?

আমি তার ডাকে চমকে জেগে উঠলাম। কিন্তু চেন্নুলুর ঘুম ভাঙল না।

সুপ্তি বলল ঃ মাস্টারজী তোমাকে ডাকছে যে!

বলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি উঠে বেরিয়ে এলাম।

বাহিরে অন্ধকার তখন আর নেই। দিনের আলোয় চারি দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। শীতের আমেজ আছে বাতাসে। পাধ্যে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন ঃ চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

এই মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোক বয়সে আমার বড়, পড়াশুনোও অনেক করেছেন। কিছু দিন আমাদের সংস্কৃত শেখাবার চেষ্টাও করেছেন। আমরা তাই তাঁকে মাস্টারজী বলি। এমনি করে তিনি আমাকে আরও কয়েক দিন ডেকে নিয়ে গেছেন। কোন দিন সকাল বেলায়, আবার বিকেল বেলাতেও কোন দিন। ভদ্রলোক হাঁটতে ভালবাসেন, আর এই সময়েই দু একটা কথা বলেন। অন্য সময়ে তাঁর গাম্ভীর্য দেখলে ভয় করে।

আমি মুখে একটু জল দিয়ে কাপড়ের খুটে মুখটা মুছে নিলাম। তারপরে গায়ে একখানা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাঁর সঙ্গে।

প্রথমে এলাম গঙ্গার ধারে। হিমালয়ের কোলে এই গঙ্গার দৃশ্য আমার অদ্ভুত ভাল লাগে। প্রতি দিনই নতুন মনে হয় এই দৃশ্য। আমি যদি কবি হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই কবিতা লিখতাম। নতুন নতুন কবিতা লিখতাম এই হিমালয় আর গঙ্গাকে নিয়ে। একটি পুরনো বাঙলা কবিতার কথা মনে এল। কিন্তু সে কবিতা আমার তত ভাল লাগে নি। আমি কবি হলে তার চেয়ে অনেক ভাল কথা লিখতে পারতাম।

চলতে চলতে পাধ্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কী ভাবছ?

বললাম ঃ এই দৃশ্য আমার খুব ভাল লাগে।

এর পরে পাধ্যে অনেকক্ষণ কথা কইলেন না। পাহাড়ের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে যখন আমরা গঙ্গার ধার থেকে দূরে চলে গেলাম তখন বললেন ঃ উপদেবতার কথা তোমার কেমন লাগছে ?

এক কথায় আমি এর উত্তর দিতে পারলাম না।

পাধ্যে বললেন ঃ সত্যি কথা বল।

বললাম ঃ এত দিন ভাল লাগছিল না।

কেন ?

যাদের কথা শুনছিলাম তাদের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা হচ্ছিল না। অনেক সময় গোঁজামিল আছে বলে মনে হচ্ছিল।

পাধ্যে বললেন ঃ একটু স্পষ্ট করে বল।

প্রথমেই আমার রক্ষের কথা মনে এল। বললাম ঃ রক্ষ মানে তো রাক্ষস। তাদের যেন আমরা অকারণে উপদেবতার দলে টেনে এনেছি। তেমনি ভূত প্রেত পিশাচের কথা। তাদের আচার বিচার ও সমাজ সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় নি।

তারপর ?

গুহ্যক বিদ্যাধর ও কিন্নরদের কথাও অস্পষ্ট রয়ে গেল।

পাধ্যে আমার কথার প্রতিবাদ করলেন না, বললেন ঃ রামায়ণের এক জায়গায় এই বিদ্যাধরদের উল্লেখ মনে পড়ছে। হনুমান যখন সাগর লঙ্ঘনের জন্য তাঁর বিরাট দেহ নিয়ে মহেন্দ্র পর্বতে এসে উঠলেন, তখন তাঁর পায়ের চাপে পর্বত বিচলিত হয়ে উঠল। শিলা স্খলিত হল, ঝরা পুষ্পে পুষ্পময় হল পর্বত, প্রাণীদের আর্ত স্বরে বাতাস প্রতিধ্বনিত হল। বিদ্যাধররা তখন তাদের পানভূমিতে হিরন্ময় আসনে বসে সোনার পাত্রে মাংসাদি বিবিধ ভোজ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এই শব্দ শুনে তাঁরা সে সব ফেলে তাঁদের সালঙ্কারা স্ত্রীদের নিয়ে সকৌতুকে এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে বেরিয়ে পড়লেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম ঃ বিদ্যাধরদের বাস কি তাহলে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে ছিল ?

পাধ্যে বললেন ঃ এই কথা শোনবার পরে তাই মনে হয়। কিন্তু

তা সত্য হলে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে। রাম যখন এই সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলেন তখন কোন বিদ্যাধর এলেন না রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, কিংবা রামও কোনও বিদ্যাধরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন না। বিদ্যাধররা কি মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না?

আর একটি কথা আমার মনে হল। বললামঃ বিদ্যাধররা যে পর্বতবাসী ছিলেন তা বোঝা যাচ্ছে। উত্তরে কৈলাস পর্বতে ও দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বতেও তাঁদের বাস ছিল। নীলগিরির নাম কি মহেন্দ্র পর্বত, না কেরালার পালনি বা কার্ডেমাম পাহাড় পরিচিত ছিল মহেন্দ্র পর্বত নামে।

পাধ্যে বললেনঃ অনেকে বলেন, মহেন্দ্র পর্বত পূর্বঘাট পর্বতের কোন অংশের নাম। উড়িষ্যার উপকূলেও হতে পারে বলে শুনেছি। পরশুরাম এই পর্বতে বাস করতেন। কিন্তু তাঁর মাতৃহত্যার পাপ খণ্ডন হয়েছিল কন্যাকুমারীর মাতৃ তীর্থে স্নান করে।

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। বড় আশ্চর্য লাগে এই সব কথা শুনতে। দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা এনেছিলেন মহর্ষি অগস্ত্য। তিনি ছিলেন মহর্ষি ভৃগুর সমসাময়িক। ভৃগুর প্রপৌত্র হলেন পরশুরাম। তিনিও যে দক্ষিণ ভারতে বসবাস করেছেন তা এত দিন মনে হয় নি। কিন্তু তিনি সারা ভারতবর্ষ পর্যটন করেছিলেন। সুদূর আসামের উত্তর পূর্ব প্রান্তে লৌহিত্য তীর্থেও আমরা ভার্গব পরশুরামকে স্মরণ করি।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে পাধ্যে বললেনঃ আমার কী মনে হচ্ছে জান? চেষ্টা করলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের একটা রূপ দিতে পারব। সমস্ত উপকরণই আমাদের আছে, কষ্ট করে শুধু একটু সাজিয়ে নিতে হবে। তার জন্যে অত্যন্ত খোলা মন চাই।

আমি নীরবে পথ চলতে লাগলাম। আর পাধ্যে বলতে লাগলেনঃ অন্ধ বিশ্বাসকে ধর্ম বলে না, কুসংস্কারও ধর্ম নয়। খোলা মন নিয়ে কাজ করতে হবে। নিজের মনকেই করতে হবে বিশ্বাসের

কষ্টি পাথর। পুরাণে যা পড়ছি তার কতটুকু সত্য বলে গ্রহণ করব, আর কতটুকু বাদ দেব অতিরঞ্জিত বলে, প্রথমে এইটেই নির্ণয় করতে হবে। তারপরে যা সত্য বলে গ্রহণ করব, তাই সাজাতে হবে সময়ের বিচার করে। আমার মনে হয় যে স্বর্গ আর পাতাল দেখা যাবে মর্ত্যেরই উত্তর ও দক্ষিণে। দেবতা আর মানুষেও প্রভেদ কমে যাবে, বিশ্বের এক বিরাট আন্তর্জাতিক সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে আমাদের ভারতবর্ষ। সুমেরু থেকে লঙ্কা পর্যন্ত এই বিশাল দেশের ইতিহাস আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেই বিধৃত আছে।

খানিকক্ষণ নীরবে চলবার পরে পাধ্যে আবার বললেনঃ এই সভ্যতার একটি কণাও অন্য কোন দেশ দাবী করতে পারবে না। কোন দেশে তার কোন দলিল নেই, কোন প্রমাণ নেই। অথচ ভারতে তার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। শুধু একটু পরিশ্রমের প্রয়োজন, একটু অধ্যবসায়ের। তারপরেই আমরা সমগ্র বিশ্বকে জানাতে পারব যে গোটা পৃথিবীটাই এক দিন ভারতের ছিল, আর ভারতের ধর্মই ছিল বিশ্বের ধর্ম। সভ্যতার আলো এই দেশ থেকেই চারি দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছে।

পাধ্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, হাঁপাচ্ছিলেন অল্প অল্প। তারপরে কী একটা ভেবে একেবারে নীরব হয়ে গেলেন।

ফেরার পথেও পাধ্যে আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু আমার মনে তাঁর কথাগুলো যেন কাজ করতে লাগল। কিছু একটা করবার জন্য মন যেন অস্থির হয়ে উঠল।



সন্ধ্যা বেলায় আবার আমরা উপাসনার মন্দিরে সমবেত হলাম। অপ্সরার কথা শেষ হলেই উপদেবতার কথা শেষ হবে। গুরুজী আজ বোধহয় অপ্সরার কথা শুরু করবেন।

তাউজী আজ উপস্থিত ছিলেন না, তিনি এলেন গুরুজীর সঙ্গে। নিঃশব্দে বসলেন নিজের জায়গায়।

গোটা কয়েক ধূপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল সুপ্তি, আর ধুনুচিতে খানিকটা ধুনো ছিটিয়ে শকুন্তলাদির পাশে এসে বসতেই চেন্নুলু আমাকে ফিস ফিস করে বলল ঃ আজ এদের কথা।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু চেন্নুলু আর কিছু বলল না।

গুরুজী বললেন ঃ গন্ধর্বের পর অপ্সরার কথা। অপ্সরা কথাটি এসেছে অপ্ বা জল থেকে। সমুদ্র মন্থনের সময় এরা সমুদ্রের জল থেকে উঠেছিল বলে এদের নাম হয়েছে অপ্সরা। রামায়ণে এদের সংখ্যা দেখা যায় ষাট কোটি, কিন্তু নানা পুরাণে এদের ষাটটি নামও পাওয়া যায় না।

তাউজী বললেন ঃ আমরা তো জন কয়েক অপ্সরার নাম জানি।

গুরুজী হেসে বললেন ঃ আর কয়েকটি নাম তোমার তালিকায় লিখে নিতে পার।

তাউজী তৎপর ভাবে তাঁর চশমাটি পরে নিয়ে বললেন ঃ বলুন।

এসেছিল। মানস পুত্রেরা যখন জন্ম নিচ্ছিলেন, তখন তো কেউ কাউকে নেবার কথা ভাবেন নি। নারীকে দেখে এ কথা কেন মনে এল! কামনা কি মানুষের একটি আদিমতম প্রবৃত্তি!

গুরুজী বললেনঃ ব্রহ্মা এবারে একজন সুন্দর পুরুষ সৃষ্টি করলেন। মনোহর তাঁর রূপ, কম্বুগ্রীব, মীনকেতু ও মকরবাহন। পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুমকার্মুকে শোভিত হয়ে তিনি জন্ম নিলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। পুরুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে প্রশ্ন করলেন, কী কাজ হবে আমার?

ব্রহ্মা বললেন, তুমি সবার হৃদয়ে প্রবেশ করে সৃষ্টির সহায়তা কর। শুধু দেব গন্ধর্ব যক্ষ রক্ষ নয়, মানুষ ও সকল প্রাণীর উপরে তুমি আধিপত্য কর। তোমার ওই পঞ্চশরে সবার চিত্ত চঞ্চল হবে, সৃষ্টির বাসনা জাগবে সবার প্রাণে। তুমি কামদেব, মদন মন্মথ কন্দর্প নামে তুমি বিখ্যাত হবে।

কামদেব বললেন, তবে আমার শক্তির পরীক্ষা করতে দিন। বলে তিনি তাঁর পঞ্চশর ব্রহ্মার প্রতি নিক্ষেপ করলেন। বিচলিত হলেন ব্রহ্মা, সম্মুখে দণ্ডায়মান কন্যার দিকে তাকালেন মুগ্ধ চোখে। কামদেবের শরসন্ধান ব্যর্থ হল না, সেই কন্যা থেকে চৌষট্টি কলা উৎপন্ন হল।

তাউজী বললেনঃ এই কন্যার নাম আপনি আমাদের বলেছিলেন।

গুরুজী বললেনঃ সন্ধ্যা। সন্ধ্যার সময় আমরা এঁর পূজা করি।

মদনের গল্প আমার মনে পড়ল। ব্রহ্মাকে অপদস্থ করে মদন রক্ষা পান নি। শিব উপস্থিত ছিলেন, ব্রহ্মার চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। আর ব্রহ্মা শাপ দিয়েছিলেন মদনকে, শিবের রোষাগ্নিতে তুমি দগ্ধ হবে।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেনঃ সন্ধ্যাকে কি মদন বিবাহ করেছিলেন?

গুরুজী হেসে বললেনঃ না। মদনের স্ত্রীর নাম রতি, তিনি দক্ষের দেহজাত কন্যা।

মদন ও রতির গল্প আমার ভাল লাগছিল না, আমি অপ্সরার কথা শোনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না। গুরুজী বোধ হয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পারছিলেন। তাই বললেনঃ মদনের কথা থাক, অপ্সরাদের কথাই আমি সংক্ষেপে বলি।

গুরুজী থামলেন একটুখানি, তারপরে বললেনঃ কার কথা প্রথমে বলব ?

তাউজী বললেনঃ উর্বশীর কথা।

গুরুজী বললেনঃ না। মানুষকে ভালবাসার জন্যে উর্বশীর মনুষ্য জন্ম হয়েছিল, মানুষের সঙ্গে সংসার পেতেছিলেন তিনি। উর্বশীর কথাতেই উপদেবতার কথা শেষ হয়ে যাবে।

গুরুজী ভাবতে লাগলেন।

তাউজী বললেনঃ তবে তিলোত্তমার কথা বলুন।

অসুরের কথায় কি তিলোত্তমার কথা বলি নি ?

মনে পড়ছে না।

গুরুজী বললেনঃ সাধারণ অপ্সরাদের সঙ্গে তিলোত্তমার জন্ম হয় নি। ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দৈত্যকে বধ করবার জন্য এই সুন্দরী শ্রেষ্ঠাকে সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয়েছিল।

চেন্নুলু এতক্ষণ উসখুস করছিল। গল্প শোনার আশায় সেও এবারে স্থির হয়ে বসল।

গুরুজী বললেনঃ সুন্দ ও উপসুন্দ হলেন দুই ভাই, সে হিরণ্যকশিপু বংশজাত দৈত্য রাজ নিকুম্ভের পুত্র, পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত পরাক্রান্ত দৈত্য। ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমর হবার আশায় তাঁরা কঠোর তপস্যা করেছিলেন বিন্ধ্য পর্বতে। ব্রহ্মা খুশী হয়েছিলেন তাঁদের তপস্যায়, কিন্তু বলেছিলেন যে অমরত্বের বর কাউকে দেওয়া যায় না। দৈত্যরা বললেন, তবে এই বর দিন প্রভু যে আমরা দুজনে যেন সকল প্রাণীর অবধ্য হই, শুধু নিজেরাই নিজেদের বধ করতে পারব।

ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু।

এই বর পেয়েই দু ভাই ভারী খুশী। ভাবলেন যে এতেই কাজ চলবে। ত্রিলোক জয় করা আর কঠিন হবে না। এই ভেবে তাঁরা ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে রইলেন কিছু দিন, আর উৎসব করলেন নানাবিধ। তারপরে সৈন্যদল নিয়ে স্বর্গ রাজ্য আক্রমণ করলেন। ব্রহ্মার বরের কথা দেবতারা জানতেন বলে স্বর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তারপরে তাঁরা স্বর্গ মর্ত্য পাতালবাসী সবার উপরে অত্যাচার শুরু করলেন। উৎপীড়িত দেবতা ও ঋষিদের অনুরোধে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে বললেন এক অদ্বিতীয়া নারীকে সৃষ্টি করতে। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য তিল তিল করে সংগ্রহ করে তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করলেন বিশ্বকর্মা। ব্রহ্মা তাঁকে সুন্দ ও উপসুন্দকে ভোলাতে যাবার জন্য আদেশ দিলেন।

বিদায় নেবার আগে তিলোত্তমা দেবতাদের প্রদক্ষিণ করলেন। তিলোত্তমা যেদিকে যান, দেবতারা সেই দিকেই তাকান। তিলোত্তমার রূপ দেখতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হলেন, আর ইন্দ্রের হল সহস্র নয়ন। শিব স্থির হয়ে বসে রইলেন বলে তাঁর স্থাণু নাম হল।

এবারে তিলোত্তমা চললেন সুন্দ ও উপসুন্দের কাছে। বিন্ধ্য পর্বতের নিকটে এক শাল বনে দুই ভাই সুরাপান করে মত্ত অবস্থায় ছিলেন। সুন্দরী তিলোত্তমা রক্ত বসন পরে যেই তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হল, সুন্দ অমনি তাঁর ডান হাত ধরলেন, আর উপসুন্দ ধরলেন বাঁ হাত। সুন্দ বললেন, ছাড় এঁকে, ইনি আমার স্ত্রী।

আর উপসুন্দ বললেন, তুমি আমার স্ত্রীর হাত ছাড়।

সুন্দ বললেন, ইনি তোমার গুরু স্থানীয়া।

উপসুন্দ বললেন, তোমার বধূস্থানীয়া ইনি।

তারপর দুজনেই তিলোত্তমার হাত ছেড়ে গদা নিয়ে মুখোমুখি হলেন। প্রবল যুদ্ধ হল দুজনের। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের আঘাতে পরস্পর নিহত হলেন।

গুরুজী বললেনঃ তিলোত্তমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন ব্রহ্মা। সুন্দ ও উপসুন্দের মৃত্যুর পরে দেবতা ও ঋষিদের সঙ্গে এসে ব্রহ্মা

বললেন, এখন থেকে তুমি দেবলোকে বিচরণ করবে ও তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল করে দেখতে পাবে না।

তিলোত্তমা স্বর্গের অপ্সরা বলে পরিচিত হলেন।

গুরুজী ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপরে বললেন ঃ তিলোত্তমারও মনুষ্য জন্ম হয়েছিল।

আশ্চর্য হয়ে তাউজী বললেন ঃ তাই নাকি !

গুরুজী বললেন ঃ বলির পুত্র সাহসিকের সঙ্গে তিলোত্তমা খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঋষি দুর্বাসা তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁর ধ্যান যায় ভেঙে। ঋষি তাঁকে শাপ দেন। এই শাপে তিলোত্তমার জন্ম হয় বাণের কন্যা রূপে। তাঁর নাম হয় ঊষা।

তাউজী বললেন ঃ ঊষা হরণের কাহিনী তো আপনি অসুরের কথায় বলেছেন, কিন্তু ঊষা যে শাপভ্রষ্ট তিলোত্তমা তা তো বলেন নি।

গুরুজী বললেন ঃ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে তিলোত্তমার শাপের গল্প। অন্যত্র আমরা ঊষাকে পার্বতীর পারিপার্শ্বিকা রূপে দেখি। ঊষার কথা যাক, এবারে অন্য কোন অপ্সরার কথা বলি।

আমরা নীরবে রইলাম। তাউজীও কোন কথা বললেন না। গুরুজী একটু ভেবে বললেন ঃ রম্ভাকে শাপ দিয়েছিলেন ঋষি বিশ্বামিত্র। তাঁর তপোভঙ্গ করবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র রম্ভাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মেনকার মতো ছলাকলা বোধহয় রম্ভা জানতেন না। তাই ঋষির শাপে শিলায় পরিণত হয়েছিলেন। এক হাজার বছর তাঁকে শিলা হয়ে থাকতে হয়েছিল।

তাউজী বললেন ঃ রম্ভার এই গল্প আমি প্রথম শুনলাম।

গুরুজী বললেন ঃ মহাভারতের অনুশাসন পর্বে এই গল্প আছে।

কী করে উদ্ধার হলেন রম্ভা ?

তার জন্যে স্কন্দ পুরাণ পড়তে হবে। রম্ভা বিশ্বামিত্রের আশ্রমেই শিলা রূপে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় অঙ্গারিকা নামে এক রাক্ষসী এই আশ্রমে এসে উপদ্রব শুরু করে। আরও অনেক তপস্বী ছিলেন আশ্রমে। তাঁদের মধ্যে শ্বেতমুনি বায়ব্য অস্ত্রে ওই শিলাখণ্ড

যোজন করে রাক্ষসীকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন। ভয় পেয়ে রাক্ষসী পালাতে লাগল। কিন্তু কপি তীর্থে পৌঁছবার পরে সেই শিলাখণ্ড তার মাথায় এসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল রাক্ষসীর। কিন্তু শিলাখণ্ডটি কপি তীর্থে নিমগ্ন হতেই রম্ভা তাঁর পূর্ব রূপ ফিরে পেলেন।

রম্ভার প্রতি আসক্তি ছিল তুম্বুরুর। সেই অপরাধে তুম্বুরুও শাপগ্রস্ত হয়েছিলেন। আবার রম্ভা কুবেরপুত্র নলকূবরের কাছে অভিসারে যেতেন। এমনি এক অভিসারের সময় রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন।

রম্ভার এই গল্প আমার মনে পড়ল। নলকূবরের কথায় গুরুজী আমাদের এই গল্প বলেছিলেন। রাবণের কাছে রম্ভা নলকূবরের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের কথোপকথনে জানা গিয়েছিল যে অপ্সরা বহুভোগ্যা। তাদের পতি নেই বলে পুরুষের সংসর্গে তাদের ধর্ম নষ্ট হয় না। কিন্তু উর্বশীর মতো রম্ভা রাবণকে কোন অভিশাপ দেন নি। নলকূবরের কাছে নালিশ করেছিলেন, আর নলকূবর অভিশাপ দিয়েছিলেন রাবণকে।

গুরুজী বললেন: আরও একজন অপ্সরার সঙ্গে রাবণের দেখা হয়েছিল। পুঞ্জিকস্থলা তাঁর নাম। পুঞ্জিকস্থলাও রাবণকে কোন অভিশাপ দেন নি, অভিযোগ করেছিলেন ব্রহ্মার কাছে। এই সব দেখে মনে হয় যে বর বা অভিশাপ দেবার ক্ষমতা সেকালে অর্জন করতে হত, কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সে ক্ষমতা ছিল না। ঋষিরা তপস্যার বলে এই ক্ষমতা অর্জন করতেন।

মেনকা যা পেরেছিলেন, রম্ভা তা পারেন নি বলে রম্ভাকে হেয়জ্ঞান করা উচিত হবে না। মেনকা বিশ্বামিত্রকে ভুলিয়ে দশ বৎসর তাঁর সঙ্গে সংসার করেছিলেন। কিন্তু রম্ভা সেই কাজে এসে শিলায় পরিণত হয়েছিলেন। এই দুটি ঘটনাকে বিশ্বামিত্রের জীবন দিয়ে যাচাই করে দেখতে হবে। বিশ্বামিত্র যখন পুষ্কর তীর্থে কঠিন তপস্যায় রত, তখন ইন্দ্র ভয় পেয়েছিলেন। ঋষি বা অসুরের তপস্যা দেখে ভয় পাওয়াই

তাঁর স্বভাব। পাছে কেউ তপস্যার বলে তাঁর ইন্দ্রত্ব ছিনিয়ে নেন, এই ভয়ে সারাক্ষণই তিনি অস্থির। বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য তিনি মেনকাকে নিযুক্ত করেছিলেন।

মেনকা বিশ্বামিত্রের নিকটে এলেন সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে। ঋষিকে প্রণাম করে নৃত্য দেখাতে লাগলেন। বাতাসে সেই বস্ত্র স্খলিত হয়ে পড়ল, নিরাবরণ মেনকার রূপ দেখে ঋষি মুগ্ধ হলেন। তপস্যার কথা ভুলে গিয়ে সংসার পাতলেন অপ্সরার সঙ্গে। একদিন শকুন্তলার জন্ম হল। ঋষি বুঝতে পারলেন যে তিনি প্রতারিত হয়েছেন, তপোবল ক্ষয় হচ্ছে তাঁর। তখনি তিনি মেনকার কাছে বিদায় নিয়ে হিমালয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। আর মেনকাও শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করে ফিরে গেলেন স্বর্গে।

শকুন্তলার গল্প অন্য। শকুন্ত তাকে রক্ষা করেছিল। তার পরে কণ্ব মুনি তাকে দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছিলেন। মহাভারতে আছে শকুন্তলার গল্প, দুষ্মন্তের সঙ্গে তার গান্ধর্ব বিবাহের কথাও আছে।

গান্ধর্ব বিবাহের রীতি বড় অদ্ভুত। মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন নেই, গুরুজনের অনুমতিরও দরকার নেই। নির্জনে স্ত্রী পুরুষের স্বেচ্ছা মিলনের নামই গান্ধর্ব বিবাহ। ক্ষত্রিয়ের কাছে এই রীতির বিবাহই শ্রেষ্ঠ।

আমার মনে হল যে এই বিবাহ বন্ধন বোধহয় ছিন্ন করা যেত। কিন্তু তার পদ্ধতি আমাদের জানা নেই। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মেনকারও বোধহয় গান্ধর্ব বিবাহ হয়েছিল। আর দশ বৎসর পরে ছিন্ন হয়েছিল সেই বিবাহ বন্ধন। সন্তানকেও পরিত্যাগ করে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন।

মেনকা আর একবার তাঁর সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিলেন। গন্ধর্ব রাজ বিশ্বাবসুর কাছে মেনকা এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন, কত দিন ছিলেন, আর কেন চলে গেলেন, গুরুজী এ সব কথা আমাদের বলেন নি। শুধু বলেছিলেন যে তাদেরও একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল।

স্থূলকেশ ঋষি সেই পরিত্যক্ত কন্যাকে পালন করেছিলেন। নাম রেখেছিলেন প্রমদ্বরা।

গুরুজী বললেনঃ হিমালয়ের কৌশিকী তীর্থে বিশ্বামিত্র আবার তপস্যা শুরু করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইন্দ্রিয় জয় না হলে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব লাভ হবে না। এবারে সতর্ক ছিলেন, পুনরায় ভুল করবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ইন্দ্র তাই মেনকাকে আর পাঠালেন না। মেনকা পুরনো হয়ে গেছেন। এবারে পাঠালেন রম্ভাকে। রম্ভার প্রতি আস্থা বোধহয় দেবরাজের বেশি ছিল।

কিন্তু সফল হতে পারলেন না রম্ভা। বোধহয় অন্য কোন অপ্সরাও সফল হতে পারতেন না। রম্ভার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে বিশ্বামিত্র তাঁকে শাপ দিলেন, শিলা হও।

তাতেও ইন্দ্র খুশী হলেন। শাপ দেবার জন্যেও যে ঋষির তপোবল ক্ষয় হল। আরও কঠোর তপস্যায় রত হতে হল বিশ্বামিত্রকে। তাকে ক্রোধও জয় করতে হবে।

গুরুজী বললেনঃ এই সব অপ্সরাদের আমরা স্বেচ্ছায় মানুষের কাছে আসতে দেখি না। তাঁরা নৃত্যগীতের জন্য দেবতাদের সভায় স্বাধীন ভাবে যাতায়াত করতেন। যক্ষ ও গন্ধর্বদের কাছেও তাঁদের যাতায়াত ছিল।

গুরুজী বললেনঃ ঘৃতাচী নামে একজন অপ্সরাকে আমরা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখি। তাঁর এই মেলামেশার ধরন ছিল বড় অদ্ভুত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যখন হোমাগ্নি জ্বালাবার জন্য অরণি মন্থন করছেন, ঘৃতাচী তখন এসেছিলেন তাঁর কাছে। কী উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তা জানা যায় না। অজ্ঞানতাবশত এসে পড়েছিলেন কিনা তাও কোথাও লেখা নেই। কিন্তু ঘৃতাচীকে দেখতে পেয়ে বেদব্যাস চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। আর তাঁর দৃষ্টিতে কামনা দেখে ঘৃতাচী ভয়ে শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বেদব্যাসের বীর্য থেকে জন্ম হয়েছিল শুকদেবের।

এই ভাবে দ্রোণেরও জন্ম হয়েছে। ঘৃতাচী জলে নেমেছিলেন

স্নানের জন্যে। সিক্তবসনে যখন তিনি তীরে উঠলেন, সেই যৌবনোদ্ধত সুন্দরীকে দেখে তপস্বী ভরদ্বাজ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরই বীর্যে এক দ্রোণপাত্রে দ্রোণের জন্ম।

গুরুজী বললেন: এই সব গল্পের মধ্যে অলৌকিকতা আছে, চলতি কথায় আমরা তাকে গোঁজামিল বলতে পারি। ইন্দ্র নিশ্চয়ই এই সব ঋষিদের জয় করবার জন্য ঘৃতাচীকে পাঠান নি, ঘৃতাচী নিজেই তাঁদের সম্মুখে এসেছেন, কিংবা সামনে পড়ে গিয়েছেন।

বেদব্যাসকে ভয় পাবার কারণ আমি অনুমান করতে পারি। বেদব্যাস কুৎসিত দর্শন ছিলেন। তাঁকে দেখে অম্বিকা চোখ বন্ধ করেছিলেন, আর অম্বালিকা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন ভয়ে। কাজেই ঘৃতাচীরও তাঁকে দেখে ভয় পাওয়া সম্ভব। আর সেইজন্যেই তিনি শুকপক্ষীর রূপ ধারণ করে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভরদ্বাজের বেলায় বোধহয় এ কথা খাটে না। প্রাকৃতিক নিয়মেই বোধহয় ঘৃতাচী জন্ম দিয়েছিলেন দ্রোণের।

গুরুজী বললেন: ঘৃতাচীর এক পুত্রের নাম রুরু। চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতি তার জনক। মহাভারতে এই ঘটনা খুব সংক্ষেপে আছে, তেমনি সংক্ষেপে আছে ঘৃতাচীর শত কন্যার জন্ম দানের কথা। মহারাজা কুশের পুত্র কুশনাভ এই শত কন্যার জনক। এই কন্যাদের কথা আমি বোধহয় বলেছি।

তাউজী বললেন: বলেছেন।

আমারও সেই গল্প মনে পড়ে গেল। সেই শত কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন পবন। তাদের সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন। আর কন্যারা অসম্মত হয়েছিল বলে তাদের অভিশাপ দিয়ে কুব্জ করে দিয়েছিলেন। যে জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছিল সেই জায়গারই নাম কান্যকুব্জ।

গুরুজী বললেন: এখানেও একটি ঘটনা অন্তরালে থেকে গেছে। ঘৃতাচীর সঙ্গে কুশনাভের পরিচয়ের প্রসঙ্গ আমাদের জানা নেই। অপ্সরাদের জীবনের কথা কোথাও লেখা হয় নি, পুরাণে শুধু ছোটখাট

ঘটনার উল্লেখ আছে। এগুলিকে জুড়েও কোন জীবনী রচনা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকুই প্রমাণ হয় যে অপ্সরাগণ অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, পুরুষের কাছে তাঁদের আকর্ষণ ছিল অপরিসীম, আর প্রেম ও মিলনের ব্যাপারে তাঁদের স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত ছিল। তাঁদের এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অধিকার কারও ছিল না।

তাউজী জিজ্ঞাসা করলেন: অপ্সরারা কি কাউকে বিবাহ করে সংসারী হত না?

গুরুজী বললেন: সকল অপ্সরার কথা তো আমরা জানি না। তবে বিবাহ করে সংসারী হয়েছে এমন অপ্সরার নাম জানি।

তাউজী মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন।

গুরুজী বললেন: হেমা অপ্সরা বিবাহ করেছিলেন ময় দানবকে। মন্দোদরী তাঁদের কন্যা।

তাউজী বললেন: মনে পড়েছে। কিন্তু রাবণ যখন মন্দোদরীর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন, তখন হেমা উপস্থিত ছিলেন না, তিনি দেবতাদের কাজে স্বর্গে গিয়েছিলেন। তের বছর ধরে বাস করেছিলেন স্বর্গে।

গুরুজী গম্ভীর ভাবে বললেন: প্রশ্ন একটা থেকেই যায়।



সকলের শেষে উর্বশীর কথা।

গুরুজী বললেন: উর্বশীর জন্ম নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে।

কেউ বলেন যে তিনি বিষ্ণুর উরু ভেদ করে বেরিয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে উর্বশী। আবার কেউ বলেন যে উর্বশী সপ্তমমনুর সৃষ্টি। পদ্ম পুরাণে তাঁর জন্ম বিবরণ অন্য রকম। বিষ্ণু তপস্যা শুরু করেছেন গন্ধমাদন পর্বতে, ইন্দ্রের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সেই উগ্র তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ইন্দ্র কামদেব ও বসন্তকে পাঠালেন একদল অপ্সরার সঙ্গে। বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতেই হবে। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন অপ্সরাদের উরু থেকে কামদেব উর্বশীকে সৃষ্টি করলেন। এই উর্বশীই বিষ্ণুর তপোভঙ্গে সক্ষম হয়েছিলেন।

পদ্ম পুরাণের গল্পের শেষ এখানে হয় নি। উর্বশীর সাফল্যের সংবাদ পেয়ে ইন্দ্র এলেন তাঁকে দেখতে। রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন, তাঁকে গ্রহণ করতেও চাইলেন। দেবরাজের প্রস্তাবে উর্বশী অসম্মত হতে পারলেন না। কিন্তু তার পরে মিত্র ও বরুণ এলেন একই প্রস্তাব নিয়ে। উর্বশী প্রত্যাখ্যান করলেন তাঁদের। ক্ষুণ্ণ হয়ে সেই দেবতারা শাপ দিলেন যে উর্বশী মনুষ্যভোগ্যা হবে। উর্বশীর জীবনে এই শাপ সত্যে পরিণত হয়েছিল।

গুরুজী যখন এই গল্প বলছিলেন, আমার তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল। বলাকার একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

গুরুজী বললেনঃ কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাসে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনে

উর্বশী উঠেছিলেন সমুদ্রতল থেকে। অন্যান্য অপ্সরার মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। উর্বশীর কাহিনী শুধু পুরাণে নয়, ঋগ্বেদেও আমরা উর্বশীর নাম পাই পুরূরবার সঙ্গে। এই প্রচ্ছন্ন কাহিনী শতপথ-ব্রাহ্মণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাকবি কালিদাসও এই কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর বিখ্যাত নাটক বিক্রমোর্বশী রচনা করেছেন।

গুরুজী একটু থেমে বললেন: এই কাহিনী বলবার আগে উর্বশীর সম্বন্ধে আর একটি বৈদিক কাহিনী বলা দরকার।

আদিত্য যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন মিত্র ও বরুণ। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীও সেখানে উপস্থিত আছেন। উর্বশীর রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন এই দুই দেবতা। তাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল। জন্ম হল বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের। উর্বশীকে এঁরা শাপ দিয়েছিলেন, সেই শাপেই উর্বশী পৃথিবীতে নির্বাসিতা হয়েছিলেন।

গুরুজী বললেন: দুরূহ হলেও একটি বিষয়ের আলোচনা আমাদের সংক্ষেপে করা দরকার। বেদে আমরা যে সব দেবতার উল্লেখ পাই, তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী। তেমনি বৈদিক ঋষিদেরও দেখি নক্ষত্রমণ্ডলীর এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে। বেদের কাহিনীগুলি সবই রূপক। এই কথা সত্য বলে স্বীকার করে নিলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মেরও একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সপ্তর্ষি মণ্ডলের বশিষ্ঠের মতো অগস্ত্যও একটি অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। শরৎ কালে দক্ষিণ আকাশে এই নক্ষত্র দেখা যায়। অগস্ত্যের পাশে যে ছোট তারা, তারই নাম লোপামুদ্রা।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আকাশের বর্ণবিভাকে অনেকে অপ্সরা মনে করেন। আর অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন উর্বশী। বেদের ঋষি বৃষ্টির জন্য বিশ্বদেবগণের স্তব করেছেন—গোসমূহের মাতা ইলা ও উর্বশী নদীগণের সহিত আমাদের প্রতি অনুকূল হউন; নিরতিশয় দীপ্তিশালিনী উর্বশী আমাদের যাগাদি ক্রিয়ার প্রশংসা করে এবং যজমানকে দীপ্তি দ্বারা সমাচ্ছিত করে উপস্থিত হউন।

সে যুগে উর্বশীর প্রকাশ হলে বৃষ্টি আসন্ন বলে মনে করা হত।

আর বেদের ঋষিরা মিত্র ও বরুণের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতেন। তাই উর্বশীর সঙ্গে মিত্রাবরুণের মিলনের কল্পনা করা হয়েছে। তারই ফলে অগস্ত্যের জন্ম হয়েছে কুম্ভে ও বশিষ্ঠের জন্ম জলাশয়ে। আকাশের অগস্ত্য বোধহয় পশ্চিম ভারতের মরুভূমি অঞ্চল থেকে দৃষ্ট হত। সেখানে বৃষ্টির জল ধরতে হত কুম্ভের মধ্যে। তাই অগস্ত্যের জন্ম কুম্ভের মধ্যে কল্পনা করা হয়েছে। আর বশিষ্ঠ দেখা যেত আর্যদের বাসস্থান সপ্তসিন্ধব ও ব্রহ্মাবর্ত থেকেও। সেখানে বৃষ্টির জল জলাশয়ে জমত এবং নদী বইত দেশের উপর দিয়ে। জলাশয়ে বশিষ্ঠের জন্ম এই ঘটনারই রূপক।

গুরুজী বোধহয় এই রূপকের কথা আমাদের আগে বলেছিলেন। আর একবার শুনতেই তা মনে পড়ে গেল। মনে মনে আমি এই রূপকটি কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আকাশের বর্ণবিভার নাম অপ্সরা। তার মধ্যে উর্বশীর প্রকাশ বর্ষায়। জলভরা মেঘে রঙের খেলা আরও অপরূপ। দূর দিগন্তে এই রূপের প্রকাশ দেখে মনে হয় যে সমুদ্রে ও আকাশে কোন প্রভেদ নেই, অপ্সরা যেন সমুদ্র থেকেই উত্থিত হচ্ছে 'অতলের শয্যাতল ছাড়ি।'

গুরুজী বললেন ঃ মহাকবি কালিদাস তাঁর বিক্রমোর্বশী নাটকে একটু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। একেবারে আধুনিক কায়দায় তিনি নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন ঘটালেন। রাজা পুরূরবা বিমানে চড়ে সূর্য মণ্ডল থেকে ফিরছিলেন। আকাশ পথে অপ্সরাদের আর্তনাদ শুনলেন, দেবগণের পক্ষপাতীরা আমাদের রক্ষা করুন।

রাজা বললেন, তোমাদের কী বিপদ হয়েছে বল।

রম্ভা ও মেনকা বললেন, আমাদের সখী উর্বশী চিত্রলেখার সঙ্গে কুবের ভবন থেকে ফিরছিলেন। হিরণ্যপুরবাসী কেশী দৈত্য তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

পুরূরবা বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের সখীকে উদ্ধার করে আনছি।

সত্যিই তিনি দৈত্যকে পরাজিত করে উর্বশীকে উদ্ধার করে

আনলেন। অচেতন উর্বশী চোখ মেলে দেখলেন রাজাকে। মনে তাঁর রঙ লাগল, হৃদয়ে সঞ্চার হল প্রথম প্রেমের।

গভীর মনোযোগ দিয়ে আমরা এই গল্প শুনছিলাম। গুরুজী থামতেই তাউজী বললেন : তারপর ?

গুরুজী সহাস্যে বললেন : তারপর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক। ভরত-মুনির আশ্রমে তাঁর দুই শিষ্যের কথোপকথন হচ্ছে। প্রথম শিষ্য দ্বিতীয়কে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তো গুরুদেবের সঙ্গে দেবসভায় গিয়ে সরস্বতীকৃত লক্ষ্মী স্বয়ম্বর নাটকেব অভিনয় দেখে এলে, তা কেমন জমল নাটক ?

দ্বিতীয় শিষ্য বলল, উর্বশী নিয়েছিলেন লক্ষ্মীর ভূমিকা, আব বারুণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন মেনকা। বিবিধ নাট্যরসে তন্ময় হয়ে উর্বশী অভিনয় করছিলেন, এমন সময় মেনকা জিজ্ঞাসা কবলেন, ত্রিলোকের সকল সুপুরুষ লোকপাল কেশবের সঙ্গে এখানে সমবেত হয়েছেন,—তোমার কাকে সব চেয়ে ভাল লাগল ? উর্বশীর কী হয়েছিল তিনিই জানেন। কোথায় পুরুষোত্তম বলবেন, তা নয় ; তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল পুরূরবা।

তারপর ?

এত করে শিখিয়েছিলেন গুরুদেব, তিনি রেগে গিয়ে শাপ দিলেন, স্বর্গে তোমার আর স্থান হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য, ইন্দ্র একটুও রাগ করলেন না। অভিনয় দেখা শেষ হলে লজ্জাবনতা উর্বশীকে বললেন, আমি জানি সব কথা। রাজা পুরূরবা আমার বন্ধু, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেন। তাই তাঁর উপকার করা আমার কর্তব্য। উর্বশী মাথা নীচু করে রইলেন, আর ইন্দ্র বললেন, যাও, মর্ত্যে গিয়ে তুমি পুরূরবার সঙ্গে সুখে সংসার কর, তোমাদেব সন্তান হলেই আবার তুমি স্বর্গে ফিরে আসবে।

গুরুজী বললেন : শতপথব্রাহ্মণে এই কাহিনী কিছু অন্য রকম। ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীত হচ্ছে, রাজা পুরূরবাও এই সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত আছেন। উর্বশী নাচছেন, সহসা তাঁর দৃষ্টি পড়ল পুরূরবার

দিকে। মুগ্ধ হলেন তিনি, কিন্তু নৃত্যের তাল ভঙ্গ হয়ে গেল। উর্বশীর এই অপরাধ ইন্দ্র ক্ষমা করতে পারলেন না। শাপ দিলেন উর্বশীকে। উর্বশী মর্ত্যবাসী হয়েছিলেন ইন্দ্রের শাপে।

আমার মনে হল যে এই কাহিনীটিই সত্য। ইন্দ্রের চরিত্রের যে পরিচয় পেয়েছি তাতে ইন্দ্রকে কোন উদার মনোভাবের দেবতা বলে মনে হয় নি। গুরুজীর কথায় ইন্দ্রকে একজন স্বার্থপর ঈর্ষাপরায়ণ চরিত্রহীন দেবতা বলেই আমি ধারণা করে নিয়েছি। তাই উর্বশীকে তিনি অন্য পুরুষের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে যে ঈর্ষান্বিত হবেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

গুরুজী বললেন: মর্ত্যে উর্বশী পুরূরবার কাছে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী হতে রাজী হয়েছিলেন কয়েকটি শর্তে। দিনে তিনবার পুরূরবা উর্বশীকে আলিঙ্গন করতে পারবেন, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুরূরবা তাঁর সঙ্গে শোবেন না। আর উর্বশীকে যেন পুরূরবার নগ্ন রূপ দেখতে না হয়।

এই শর্তগুলি একেক জায়গায় একেক রকম দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও দেখা যায় যে উর্বশীর দুটি প্রিয় মেষ শাবক ছিল, সে দুটি তাঁর শয়ন গৃহে বাঁধা থাকবে, রাজাকে রক্ষা করতে হবে সেই মেষ শাবক দুটি। কোথাও দেখা যায় যে পুরূরবাকে এক বেলা ঘৃতাহারী হয়ে থাকতে হবে। এই রকমের সব শর্ত। পুরূরবা এই সব শর্ত পালনে রাজী হয়েছিলেন এবং উর্বশীকে বিবাহ করে সুখী হয়েছিলেন।

উর্বশীও যে সুখী হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তার কারণ স্বর্গে ফিরে যাবার কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। বহু দিন কেটে যাবার পরে গন্ধর্বরা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন উর্বশীর জন্য, ভাবলেন যে স্বর্গে তাঁকে ফিরিয়ে আনা দরকার। কিন্তু কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করবেন! উর্বশীর শর্ত ভঙ্গ করাবেন কে?

ঠিক হল যে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু এই কাজ করবেন। অনেক চিন্তা করে এক দিন রাতে তিনি উর্বশীর শয্যার সঙ্গে দুটি মেষ শাবক বেঁধে রেখে এলেন। তারপরে অন্ধকার রাতে একটি চুরি করে নিয়ে

গেলেন। শব্দ শুনে উর্বশী জেগে উঠেছিলেন। কিন্তু নিজের শয্যায় রাজা ছিলেন নিদ্রামগ্ন। উর্বশী তাঁকে জাগিয়ে সেই মেষ শাবক উদ্ধার করতে অনুরোধ করলেন।

সদ্যোনিদ্রোত্থিত রাজার মনে ছিল না যে তিনি নগ্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন। উর্বশীর অনুরোধে চোরকে যেই অনুসরণ করতে যাবেন, আকাশে তখনই বজ্রপাত হল। উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হল রাজপ্রাসাদ, আর সেই আলোতে উর্বশী পুরূরবাকে নগ্ন দেখলেন। সফল হলেন গন্ধর্বরা, উর্বশীর শর্ত ভঙ্গ হয়েছে। তিনি বিদায় নিলেন রাজার কাছ হতে।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি প্রশ্ন মনে এল। উর্বশী কি গন্ধর্বদের কৌশল জানতেন? বিশ্বাবসু কি উর্বশীর সঙ্গে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় শতপথব্রাহ্মণে নেই, কোনও পুরাণেও বোধহয় এর উত্তর পাওয়া যাবে না। আমার মনে হল যে উর্বশী এ কথা জানতেন না, জানলে তিনি পুরূরবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। উর্বশী-পুরূরবার প্রেমে যে কোন খাদ ছিল না, তাই আমার মনে হয়েছে।

গুরুজী বললেন: উর্বশী-পুরূরবার বিদায়ের দৃশ্য আছে ঋগ্বেদে। সে বড় নাটকীয় দৃশ্য, বড় করুণ, বড় সারগর্ভ। মূল না পড়লে তার সৌন্দর্যের সম্বন্ধে কোন ধারণা হবে না।

তাউজী বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে ছিলেন গুরুজীর দিকে।

গুরুজী বললেন: কিছু শোনবার ইচ্ছা আছে?

নিঃশব্দে তাউজী মাথা নাড়লেন।

গুরুজী বললেন: হয়ে জায়ে মনসা তিষ্ঠ ঘোরে বচাংসি মিশ্রা কৃণবাবহৈ নু।

লিখতে আরম্ভ করে তাউজী থমকে থেমে গেলেন। এ তো সাধারণ সংস্কৃত নয়, এ বেদের শ্লোক। এ লিখে নেওয়া শক্ত কাজ। গুরুজী হেসে বললেন: মানেটা শুনে রাখ। পুরূরবা বলছেন, হে জায়া, তুমি দাঁড়াও! কী কঠিন তোমার মনোভাব! এস আমরা পরস্পর

কয়েকটি কথা বলি। আমাদের মনের কথা যদি অব্যক্ত থেকে যায় তাহলে ভবিষ্যতে তা সুখের বা কল্যাণের হবে না।

উর্বশী বললেন, এখন আর এ সব কথায় আমাদের কী হবে! আদি উষার মতো আমি পরান্তরে চলে এসেছি। বাতাসের মতো আমাকে ধরে রাখা এখন দুঃসাধ্য। হে পুরূরবা, তুমিও পারান্তরের প্রতিষ্ঠানে উঠে এস। পুনরস্তং পরেহি।

গুরুজী বললেন: ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আঠারোটি শ্লোকে উর্বশী-পুরূরবার সংলাপ আছে। অত্যন্ত গভীর অর্থ। উর্বশী বৃহৎ দ্যুলোক, তাঁর জ্যোতির্ময় প্রতিষ্ঠানে সত্যের প্রকাশ। আর পুরূরবা মনোময় মানুষ, তাঁর বিপুল কণ্ঠধ্বনিতে প্রকাশের ব্যাকুলতা। মানুষকে সত্যের সন্ধান দিতে উর্বশী নিচে নেমেছিলেন, পূর্ণ রূপান্তরের জন্য পুরূরবাকে এবারে উপরে উঠতে হবে।

গুরুজী এবারে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে বললেন: থাক এ সব কথা, এ সব তত্ত্ব কথায় গল্পের মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হবে।

হাতের পেনসিল তাউজী তাঁর খাতার উপরে নামিয়ে রেখেছিলেন। বললেন: সেই ভাল।

গুরুজী বললেন: গন্ধর্বদের সঙ্গে উর্বশী ফিরে গেলেন স্বর্গে। আর উর্বশীকে পুনরায় পাবার জন্যে বিরহী পুরূরবা দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শোকে তাঁর শরীর ক্ষীণ হল, দুর্বল দেহ ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। সহসা একদিন কুরুক্ষেত্রের নিকটে তিনি উর্বশীকে দেখতে পেলেন, হংসীর আকারে চারজন অপ্সরার সঙ্গে তিনি সরোবরে স্নান করছিলেন। পুরূরবা এগিয়ে গেলেন উর্বশীর কাছে। কাতর ভাবে অনুনয় করলেন, ঘরে চল। কিন্তু উর্বশীর মন আর বিচলিত হল না। তিনি বললেন, যাবার আর উপায় নেই। কিন্তু পুরূরবাও নাছোড়বান্দা, উর্বশীকে না নিয়ে তিনি আর ফিরবেন না। শেষ পর্যন্ত উর্বশীকে একটি শর্তে রাজী হতে হল— প্রতি বৎসর শেষ রাত্রে উর্বশী আসবেন পুরূরবার কাছে, বছরে একটি রাত তিনি রাজার কাছে কাটাবেন।

এবারে তাঁদের মিলন সম্পূর্ণ হল। একটি একটি করে উর্বশী রাজাকে আটটি সন্তান দিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হলেন আয়ু। পুরূরবা গন্ধর্বদেরও খুশী করতে পেরেছিলেন। একদিন উর্বশী বললেন, রাজা, গন্ধর্বরা তোমাকে বর দেবেন। রাজা বললেন, আমি তো তোমার সঙ্গ ছাড়া আর কোন বর চাই নে। গন্ধর্বরা তাঁকে সেই বরই দিলেন। পুরূরবা এলেন গন্ধর্বলোকে, উর্বশীর সঙ্গে একত্র বাসের অধিকার পেলেন। অমর হল মানুষের সঙ্গে অপ্সরার প্রেম।

আমি ভেবেছিলাম যে উর্বশীর কথা বুঝি এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গুরুজী বললেন: পুরূরবার কথা শেষ হল, কিন্তু উর্বশীকে আমরা এর পরেও দেখতে পাই। একদিন দুদিন নয়, কয়েক যুগ পরে। পুরূরবা ছিলেন চন্দ্রবংশের রাজা, চন্দ্রের পুত্র বুধ আর পৌত্র পুরূরবা। পুরূরবার মায়ের নাম ইলা, আর দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা তাঁর পিতামহী। এ কাহিনী তোমাদের আগেই বলেছি। উর্বশী আয়ুর মাতা আর কয়েক শো বছর পরে আয়ুর বংশেই জন্ম হয়েছিল পঞ্চপাণ্ডবের। বনবাস কালে অর্জুন এসেছিলেন ইন্দ্রলোকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য। উর্বশী তখনও ইন্দ্রসভার শ্রেষ্ঠ অপ্সরা। মুগ্ধ হয়ে অর্জুন তাঁর নৃত্য দেখেছিলেন।

তাউজী বাধা দিয়ে বললেন: না না, এমন সংক্ষেপে নয়, আপনি ধীরে ধীরে বলুন এই গল্প।

গুরুজী সহাস্যে বললেন: মহাভারতের গল্প মনে নেই বুঝি! দিব্যাস্ত্র লাভের জন্য অর্জুন কঠোর তপস্যা করেছেন। খুশী হয়েছেন দেবতারা। ইন্দ্র তাঁর রথ পাঠিয়েছেন, সারথি মাতলি এসেছে রথ নিয়ে। অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে মন্ত্র জপ ও পিতৃ তর্পণ করে হিমালয়ের স্তব করে রথে উঠলেন। সেই দশ হাজার অশ্বের রথ আকাশে উঠে মানুষের অদৃশ্য লোকে চলে এল। সেখানে চন্দ্র সূর্য বা অগ্নির আলোক নেই, শুধু বড় বড় তারা দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে অর্জুন অমরাবতী পৌঁছে গেলেন। দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নামালেন। অর্জুন তাঁদের প্রণাম করলে ইন্দ্র অর্জুনকে নিয়ে

সিংহাসনে বসলেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বরা গাইতে আরম্ভ করলেন এবং উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন।

এর পরেই উর্বশীর অভিসারের গল্প।

চিত্রসেন এক দিন উর্বশীর কাছে গিয়ে বললেন, কল্যাণী, দেবরাজের আদেশে আমি তোমাকে জানাতে এসেছি যে অর্জুন তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, আজ তিনি তোমাকে বলতে চান, দেহিপদপল্লবমুদারম্।

চিত্রসেনের মুখে এই কথা শুনে উর্বশী বেশ সম্মানিত মনে করলেন, স্মিত হাস্যে বললেন, সখা, আমিও তো তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছি, আমি যাব তাঁর কাছে।

চিত্রসেন ফিরে গেলেন, আর দিবাবসানে উর্বশী অভিসারের জন্য তৈরি হলেন। স্নান করে মনোরম বস্ত্রালঙ্কার পরলেন, গলায় ধারণ করলেন গন্ধ মাল্য। সন্ধ্যায় চন্দ্রোদয় হলে অর্জুনের গৃহের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর মৃদু কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশ কুসুম শোভিত। তাঁর সৌম্য কান্তি ভ্রূক্ষেপের মতো মধুর আলাপ ও মুখচন্দ্রিমা দিয়ে আকাশের চাঁদকে যেন আহ্বান করছেন। দিব্য অঙ্গরাগ চন্দন ও মাল্য বিভূষিত বক্ষ তাঁর প্রতি পদক্ষেপে স্পন্দিত হচ্ছে। অল্প মদ্য পান করেছেন তিনি, কামাবেশ ও বিলাসে এখন তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

দ্বারপালের মুখে উর্বশী এসেছেন শুনে অর্জুন শঙ্কিত মনে এগিয়ে এলেন। উর্বশীর দিকে তাকিয়েই অর্জুন লজ্জায় চোখ ঢাকলেন। বললেন, দেবী, মাথা নিচু করে আমি আপনাকে অভিবাদন করছি। আপনার কী আজ্ঞা বলুন।

অর্জুনের কথায় উর্বশীর যেন চেতনা লোপ হল। বললেন, চিত্রসেন আমাকে যা বলেছেন তা জান না! তোমাকে অভ্যর্থনার জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোৎসব করেছিলেন, তাতে দেবতা ও ঋষিদের সামনে গন্ধর্বরা বীণা বাজিয়েছিল আর শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা নৃত্য করেছিল। তুমি নাকি সে সময়ে শুধু আমাকেই দেখেছিলে অনিমেষ নয়নে! সভা ভঙ্গের

পর দেবরাজ চিত্রসেনকে দিয়ে আমার কাছে আদেশ পাঠালেন, সেই আদেশে আমি তোমার কাছে এসেছি। শুধু আদেশ পালন করতে আসি নি, আমিও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

লজ্জায় অর্জুন এবারে কানে হাত দিলেন। বললেন, সৌভাগ্যবতী, এ আপনি কী বলছেন! আমাদের বংশের জননী আপনি, আমার মায়ের মতো পূজনীয়া। গুরুর চেয়েও গুরুতরা বলে আমি আপনার দিকে উৎফুল্ল চোখে চেয়েছিলাম।

উর্বশী এ কথায় লজ্জা পেলেন না। বললেন, অর্জুন, আমাকে ও চোখে দেখা তোমার উচিত হচ্ছে না। অপ্সরারা কোন নিয়মাধীন নয়।

কিন্তু অর্জুন মানলেন না উর্বশীর কথা। বললেন, বরবর্ণিনী, আমি আপনাকে প্রণাম করছি। মা যেমন নিজের পুত্রকে করেন, তেমনি আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

ক্রোধে জ্বলে উঠলেন উর্বশী। কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমি নিজে তোমার গৃহে এসেছি, আর তুমি আমার অনাদর করলে! আমি তোমাকে শাপ দিচ্ছি, নপুংসক নর্তক হয়ে তুমি নারীদের মধ্যে বিচরণ করবে।

বলে ব্যর্থ মনোরথ উর্বশী তাঁর স্বগৃহে ফিরে এলেন।

ইন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে অর্জুনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, উর্বশীর অভিশাপে তুমি এক বৎসর নপুংসক হয়ে থাকবে। অজ্ঞাত বাসের সময় এই শাপ তোমার কাজে লাগবে।

তারপরে সহাস্যে বললেন, সংযমে তুমি ঋষিদেরও পরাজিত করেছ।

ভারি আশ্চর্য বোধ হল আমার। অর্জুনের সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম ছিল। তিনি নানা স্থানে বিবাহ করেছেন। অথচ উর্বশীকে মা বলে ফিরিয়ে দিলেন।

গুরুজী বললেনঃ কোন দেবতা নয়, অসুর নয়, তপস্যারত ঋষিও নয়, সাধারণ একজন মানুষ উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাই এ আঘাত উর্বশী সহ্য করতে পারেন নি, শাপ দিয়েছিলেন অর্জুনকে। অর্জুন নপুংসকের মতো আচরণ করেছিলেন বলেই ওই রকমের শাপ দিয়েছিলেন।

আমার মনে হল যে আমরা একটি কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়েছি। অর্জুন কি উর্বশীকে বৃদ্ধা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন! বেশবাস ও অলঙ্কারে কি উর্বশী তাঁর বয়স গোপন করতে পারেন নি! কিন্তু অপ্সরা তো অনন্ত যৌবনা বলে শুনেছি! তবে কেন উর্বশীকে এই অপমান সইতে হল!

অর্জুন এই ঘটনার পরেও অমরাবতীতে পাঁচ বৎসর বাস করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে গীতবাদ্য ও নৃত্য শিখেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গুরুজী বললেন: অপ্সরাদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বাকি আছে।

হাসতে হাসতে বললেন: কিছু দিন আগে মানুষের বিশ্বাস ছিল যে ভূতে পাবার মতো মানুষকে অপ্সরাতেও পায়। এক রকমের মত্ততা আসে তখন। ভূতের ওঝার মতো তখন অপ্সরার ওঝা ডাকতে হয়।

বলে তিনি উঠে পড়লেন।

তাউজী বললেন: উপদেবতার কথা কি তাহলে শেষ হয়ে গেল?

গুরুজী বললেন: বলবার মতো গল্প তো আর নেই। কাজেই শেষ হল বইকি!

উপদেবতার কথা শেষ হয়ে গেল! আমার যেন বিশ্বাস হল না এই কথা।



রাতের আহার সেরে আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম। উর্বশীর কথাই আমার মনের ভিতর গুঞ্জন করে উঠল। স্কুলে পড়বার সময় রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কবিতা আমি আবৃত্তি করেছিলাম। তারই কয়েকটি লাইন আমাব মনে পড়ল।

যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব শোভনা উর্বশী।
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যাব ফল,
তোমারই কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদিব গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

কিন্তু তারপরেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে চেন্নুলু এখনও ফেরে নি। সে কি সেদিনের মতো গঙ্গার ধারে চলে গেছে! গান গাইছে জলের ধারে পাথরের উপরে বসে অন্যমনস্ক মনে!

কেন জানি না, আমার মনও আজ গঙ্গার দিকে টানল। আমিও ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে মিটমিট করে। আশ্রমের কেউ এখনও ঘুমিয়ে পড়ে নি। আমার চোখেও ঘুম নেই।

সেদিনের মতো আজও আমি গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে সেই পাথরের উপর বসে চেমুলু গান গাইছে। দূর দিগন্তে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। হৃদয় আজ তার কার মহিমা দেখছে জানি না।

আমি তার কাছে যাব, না ফিরে আসব, এই কথাই একবার ভাবলাম। তারপরে আর একটি পায়ের শব্দ পেয়েই ফিরে এলাম।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা আমার মনে পড়ল।—

থাকো স্বর্গ হাস্যমুখে, করো সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরই সুখস্থান—
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।

উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনীতে এই সত্যটিই প্রমাণিত হয়েছে। দীর্ঘ দিন সংসার করবার পরে পুরূরবাকে ফেলে যেতে উর্বশীর হৃদয় কাঁদল না, কিন্তু পুরূরবা কেঁদে কেঁদে বেড়ালেন। তেমনি পুণ্যবল ক্ষীণ হবার পরে স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার সময়েও লেশমাত্র অশ্রুরেখা স্বর্গের নয়নে দেখা যায় না। দুঃখ নেই তার জন্য।

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।
হে অপ্সরী,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান—লইনু বিদায়।
তুমি কারে কর না প্রার্থনা, কারো তরে
নাহি শোক।

কিন্তু—

ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো-এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে যে আপনার সৌভাগ্যগণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দনচর্চিত ভালে রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরিসঙ্গীতে। তার পরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কন করে,
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু,
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।

এই তো আমাদের পৃথিবী! এই পৃথিবীর কথাও কি মূল্যবান নয়!

॥ উপদেবতার কথা সমাপ্ত ॥